বাতায়ন

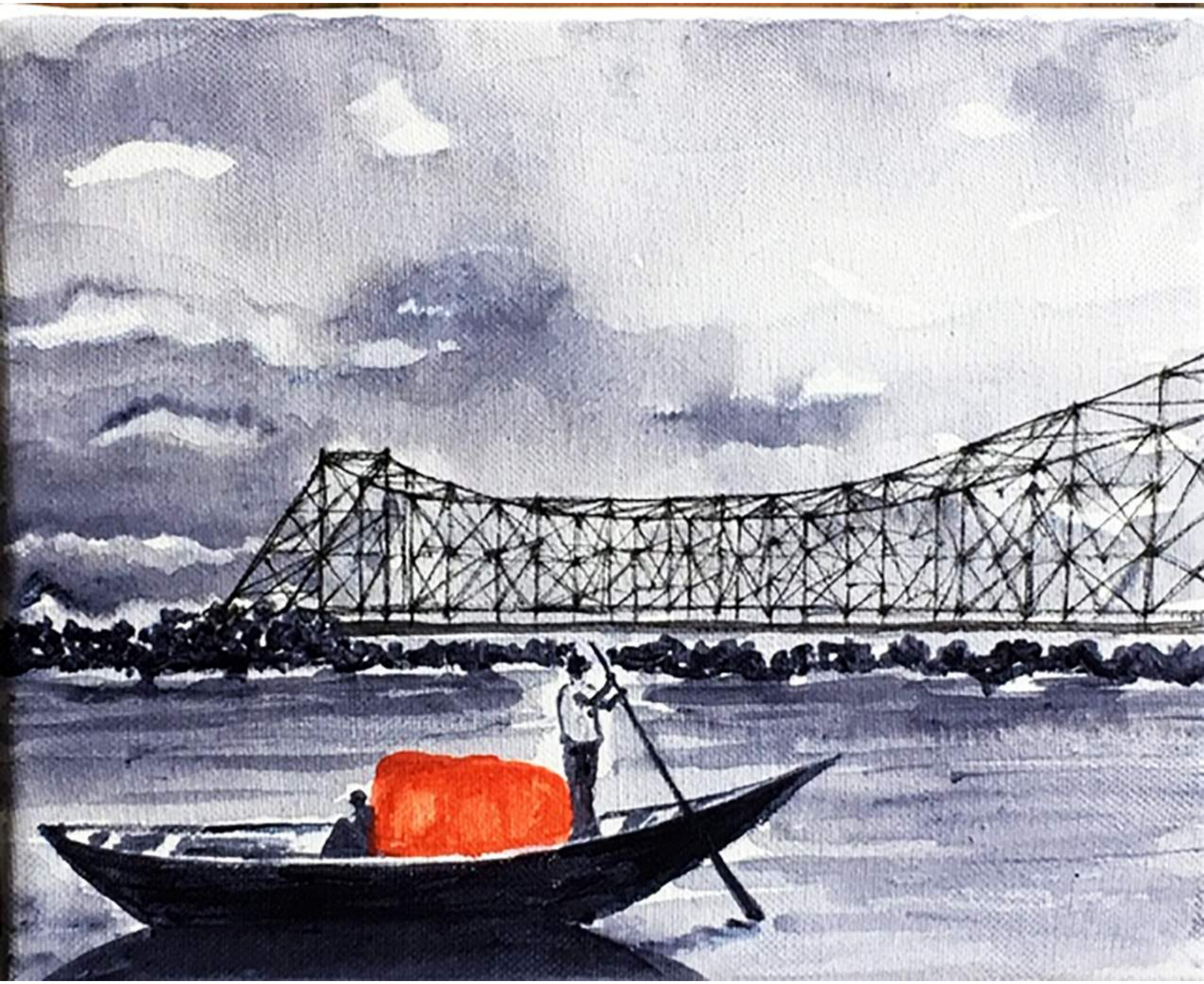

কাগজের নৌকা

BOOKS NOT BOMBS

কাগজের নৌকা

১৬তম সংখ্যা, জুন ২০২১

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

Issue Number 16 : June 2021

Photo & Artwork Credit

Partha Pratim Ghosh **Painting : Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Ranjita Chattopadhyay **Inside Front Cover**

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – শিকাগোর বাসিন্দা । পেশায় শিক্ষিকা । আর নেশায় পড়ুয়া । বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত । রঞ্জিতা বাতায়নের গোষ্ঠী সম্পাদিকা । গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে' ওনার লেখা বের হচ্ছে । শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত । সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys'' । সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার ।

Mousumi Roy **বেনারসে গঙ্গার ঘাট : Title Page**

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

Subramaniam Bhatt, Perth, WA **Inside Back Cover**

Subramaniam Bhatt is a professional Hindu priest and enthusiastic photographer.

Banksia (Grevillea) - Native Bush Plant of Western Australia. Photo taken during bush walk around the Swan River.

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editors (Volunteer)
Sugandha Pramanik
Melbourne

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

৩রা মে, ১৯১৬ সকাল, কলকাতা বন্দর থেকে “তোসামারু” জাহাজ ছাড়লো গন্তব্য জাপানের “কোবে” শহর। পথে পড়বে রেঙ্গুন, হংকং ও আরও শহর। জাহাজের অন্যতম যাত্রী, আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঝড় ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে ৭ই মে ১৯১৬ সকালে “তোসামারু” ছুঁয়ে ছিল সেই অবিচল লক্ষ্য – রেঙ্গুন বন্দর।

অতিমারীর দিন গুলোয় অনেক হাত ছেড়ে যাচ্ছে, অনেক প্রিয় মুখ হারিয়ে যাচ্ছে। তেমনই গত ২১শে এপ্রিল আমরা হারিয়ে ফেলেছি কবি শঙ্খ ঘোষ'কে। যিনি বলেছিলেন –

“স্তব্ধ সুদূর প্রান্তে ওড়াও উত্তরীয়

দৃষ্টি মেলুক দেশান্তরের মুগ্ধ হাওয়া

যুক্তচরণ ছন্দে প্রাণের মুক্তি নিয়ো

সমাপ্ত হোক সমাপ্ত হোক ক্লান্ত চাওয়া ...”

এক ঝলক তাজা হাওয়ার মতো দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে থাকা পরিচিত ও নতুন লেখক লেখিকাদের একগুচ্ছ লেখা নিয়ে করোনায় আক্রান্ত সময়ের উত্তাল ঝড় ঝঞ্ঝাকে সামলে প্রতিবারের মত এবারের বাতায়নের ১৬তম ধারাবাহিক কাগজের নৌকা এসে নোঙর ফেললো মনের বন্দরে। আশা রাখবো মূলধারার সাহিত্যের প্রতি পাঠক মনের ক্লান্ত চাওয়ার অবসান ঘটাবে এবারের কাগজের নৌকা।

লেখকের সৃষ্টি ও পাঠকের মননশীলতার মেলবন্ধন খুব সামান্য কাজ নয়। পাঠকের মনের অন্ধকারে আলোর প্রদীপ জ্বালানোর কাজ কাগজের নৌকা করে আসছে বরাবরের মতো। তাই বলি

... সন্ধে বেলায় প্রদীপ জ্বালাই তুলসিতলার ঘরে,

ফের আশা, যেন মিলতে পারি অতিমারীর পরে।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

সনেটগুচ্ছ	পল্লববরন পাল	৭
সুখপাখি	শ্যামলী আচার্য	১৫
চা-ঘর	রমা জোয়ারদার	২৫
সময়	সৌমিত্র চক্রবর্তী	৩০
পরবাসী	শকুন্তলা চৌধুরী	৩৫
আব্দুল চাচার লড়াই	মমতা দাস (ভট্টাচার্য)	৪৬
যুদ্ধ শেষ – পাকিস্তানের মাটিতে ছয়মাস – মেরাজকে থেকে সংরুর	প্রশান্ত চ্যাটার্জী	৫২
ষষ্ঠেন্দ্রিয় ছলনা	পারিজাত ব্যানার্জী	৫৬
অতলান্ত কথা	সুব্রত ঘোষ	৬৮

কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ

যাত্রা	অমর্ত্য দত্ত	৫
বাসন্তিক	অমর্ত্য দত্ত	৬
সুল্লি পুঢোম : জীবন, দর্শন, কবিতা	উদ্দালক ভরদ্বাজ	৮
পুরোনো দিনের কথা	প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য	৪৩
বিজয়ার প্রণাম	রঞ্জন চক্রবর্তী	৫৮
সমরেশ বসুর দুনিয়া	অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়	৬৩

অমর্ত্য দত্ত

যাত্রা

কালো রাত্তির সাদা যূথিকা ।
তার ঘ্রাণ না মাখলে ক্ষতি কার ?
তাই বাগানের দিকে যাত্রা ....

এখানে ইচ্ছের রঙ গোলাপী ।
শ্বেত পাথরের মতো খোলা পিঠ ।
আছে স্বপ্নেরও তাপমাত্রা ।

আঁকা জাফরিতে বৃত্তান্ত ।
তাজমহলের মতো শান্ত ।
ছুঁলে, বাতাসের থেকে সায় নিই ।

চাঁদ জানালায় নেই, সৎ সে
আর ঢাকা খুলে রাখা মৎসের,
সব বিড়ালেই চেনে ডাইনিং.....

নীল বিছানায় সাদা যূথিকা ।
এত কষ্টের একই প্রতিকার ।
ক্রমে ঘন হয়ে আসে নিঃশ্বাস ।

এই পাশ ফিরে শুলো। কালো রাত ....
আমি প্রত্নতাত্ত্বিক ইলোরা-র ।
তুলি অতলের থেকে কিস্‌সা ।

মম কুঞ্জে ছড়ায় গুঞ্জন,
তব লীন হয় রাগপুঞ্জ
ধীরে কেঁপে ওঠে উপলব্ধি ।

কালো রাত্তির, নীল বিছানায়
যেই বাহুডোরে বেঁধে কাছে নেয়....
আমি যমুনার জলে ডুব দিই ।

অমর্ত্য দত্ত

বাসন্তিক

এসো বসন্ত। এসো শব্দ-ভোর। সান্ধ্য-লেখা এসো ।
একে একে ছুঁয়ে দেখ প্রাপ্তি ও ভার ।
এসো আহেলী। এসো ছন্দ-প্রসবী কুসুমিতা ।
মাখো জল। খোলো বর্ম হও একাকার ।
আরও ঘন করো দেহ। নিমগ্নে করো বিস্তার ।

মাটি আরও মাটি দাও অতৃপ্ত পাণ্ডুলিপিতে ।
এসো হে মালিনী। এসো ঋতুদর্শী, হিরণ্যময়ী ।
যত ক্ষয় । যত ধূসরতা ঢেকেছি শীতের চাদরে ।
শুষে নাও সম্ভার। বলো আমি বিশুদ্ধ নই ?
ধরো বীজ, আমাকে ফুটিয়ে তোলো মাভৈঃ মাভৈঃ ।

এই তো স্বপ্নপথ। এই পথে এসো অংশুমালা ।
এক কাব্য নদীজল। এক জন্ম নীল কল্পরেখা ।
মাখো জল ঘননীল। হও একাকার ।
আমাকে ধারণ করো ভরাও প্রশাখা ।
এসো বসন্ত, শব্দ-ভোর। এসো সান্ধ্য-লেখা ।

অমর্ত্য দত্ত – জন্ম-১৯৮৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মধ্য কলিকাতার একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে । শৈশব থেকেই বাংলা কবিতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও ভালোবাসা ছিল । পরবর্তী সময় স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে এই জগতে প্রবেশ । গত কয়েক বছর ধরে বিবিধ লিটিল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত ও নিয়মিত লেখেন । পেশা : কলিকাতার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত । নেশা : কবিতা ও কবিতা সম্বন্ধীয় সব কিছু.... দ্রষ্টব্য : ২০২০ সালে কবিতায় এ'পার ও'পার ৬ সংকলন-এ, কেয়াপাতা শারদ সংখ্যা ১৪২৭, কবিতাকুটির প্রকাশিত বিভিন্ন সংখ্যায় ও নানাবিধ ই-ম্যাগাজিন কবিতা প্রকাশ পেয়েছে ।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ৩৪

সোনার বাংলাদেশের সোনার ছেলে
রূপনগরের রূপোর বরণ মেয়ে —
অযথা এদের অরূপকথার চেয়ে
বরং পঙ্খীরাজের পাখনা মেলে
চলো ঘুরে আসি মধ্য আফ্রিকায় —
মন্বন্তর পীড়িত কঙ্কালেরা
রাত্রি যাদের রুটির স্বপ্নে ছেঁড়া,
তারা ভালোবাসা রাখে কোন পাঁজরায় ?
শিখে আসি চলো তাদের জীবন দেখে —
বেঁচে থাকবার অহংকারের ভাষা,
আগুন ক্ষুধায় প্রেম আসে কোত্থেকে,
দুর্ভিক্ষে কি ধরাশায়ী ভালোবাসা ?

ফিসফিসে বলে পাঁজরার হাড়-খাঁচা —
ভালোবাসা মানে মন্বন্তরে বাঁচা ।

পল্লববরন পাল — জীবিকাসূত্রে স্থপতি । বিদেশে আন্তর্জাতিক কন্সাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চিফ্ আর্কিটেক্ট হিসেবে ২০১৮ সালে অবসর নিয়ে ফিরেছেন । সঙ্গীত নাটক চিত্রশিল্প সহ সাহিত্যের আকৈশোর হোল্‌সেল্ প্রেমিক । নয় নয় করে এ যাবৎ আঠারোটি গ্রন্থের রচয়িতা — যার মধ্যে একটি গদ্যউপন্যাস, একটি পদ্য উপন্যাস । কিন্তু আদপে এডভেঞ্চার প্রিয় আপামাথা কবি । এক টেবিলে ঠায় বসে থাকার পাব্লিক নন । নিজস্ব কাব্যিক ভাষাশৈলিতে ইদানিং প্রবন্ধ ও লিখছেন ‘অনুষ্টুপ’ ‘আরেক রকম’-র মতো নামী পত্রিকায় ।

উদ্দালক ভরদ্বাজ

সুল্লি পুঢোম : জীবন, দর্শন, কবিতা

সুল্লি পুঢোম (সাহিত্য নোবেল, ১৯০১)

জন্ম: ১৬ মার্চ, ১৮৩৯, প্যারিস, ফ্রান্স

মৃত্যু: ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭, শাটিনে মালাবারিস (Châtenay-Malabry) ফ্রান্স

নোবেল প্রাপ্তির সময়ে আবাস: ফ্রান্স

নোবেল প্রাপ্তির প্রণোদনা: "যেখানে শৈল্পিক সৌকর্যের সাথে মিশে রয়েছে উচ্চ আদর্শবাদ, হৃদয়বত্তা ও মেধার এক দুর্লভ সংমিশ্রণ, সেই কাব্য কৃতির বিশেষ স্বীকৃতি স্বরূপ।"

ভাষা: ফরাসী

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা: ২৫ বা তার ওপরে

প্রথম প্রকাশিত কবিতা: ২৬ বছর বয়েসে

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: Stances et poems (Stanzas and Poems 1865)

শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: Les Epaves [Flotsam], 1908 (মরণোত্তর)

বিখ্যাত কবিতা: Le vase brise (The Broken Vase, 1865)

জীবিকা: ইস্পাত কারখানায় কেরানী, নোটারী অফিসে ওকালতি, লেখক

কবিতা প্রসঙ্গে পুঢোম:

১৮৬৫ সাল থেকে সুল্লি পুঢোম কবিতা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ Stances et poems এর ভাবনার মূলে ছিল তার ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের তিক্ততা এবং নৈরাশ্য। পুঢোমের কবিতার শরীর থেকে এই মেলানকলি অবশ্য কখনোই যায় নি। জীবনের মধ্যভাগে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন French Parnassian school নামে এক কবি গোষ্ঠীর সঙ্গে। এঁরা থিওফাইল গথিয়ার (Théophile Gauthier)-এর আদলে কবিতাকে তার ক্লাসিক রূপে ফিরিয়ে নিয়ে তার হৃত আভিজাত্যে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজে আগ্রহী ছিলেন। La Parnasse Contemporain anthology নাম একটি কবিতা সংগ্রহের নামে থেকেই এই দলের নামের উৎপত্তি। পুঢোমের কবিতায় অবশ্য প্রাচীন রীতির প্রতি আনুগত্যের সাথে মিশে থাকত বিজ্ঞান ও দর্শনের কথাও। সুইডিশ আকাদেমির মতে পুঢোমের কবিতার এই ভাবের উচ্চতা নোবেল পুরস্কারের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনের থেকে এক মহত্তর আদর্শের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে সহায়ক। যদিও তাঁর কবিতার দুটিই মূল সুর, ব্যাথাতুর ভালবাসা এবং এপিকিউরিয় দর্শনত্বত্ত্ব, তবু তাঁকে মানুষ আনন্দ, সৌন্দর্য ও উচ্ছলতার কবি হিসেবেই মনে রেখেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যচর্চাঃ

১৮৩৯ সালে এক ফরাসী দোকানীর বাড়িতে জন্ম হয় পুঢোমের, তখন অবশ্য হুইনে ফোঁসোয়া আহমো পুঢোম (René François Armand Prudhomme) ছিল তাঁর নাম। দু বছর বয়েসে পিতাকে হারান তিনি, বড় হন কাকার বাড়িতে।

বাবার নাম ছিল সুল্লি, তাই নিজের নামের আগে জুড়ে নেন বড় হয়ে। স্কুলে তাঁর পছন্দ ছিল ক্লাসিক সাহিত্য এবং গণিত। লিসি বোনাপারখ (Lycée Bonaparte) কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর, ১৮৫৭ সালে তিনি বিজ্ঞানে ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্যে ভর্তি হন। কিন্তু চোখের অসুখের কারণে সেই পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয় তাঁকে। ১৮৫৮ সালে দর্শন শাস্ত্রের ব্যাচেলর ডিগ্রি পান। উদ্যমহারা না হয়ে কাজ নেন তিনি লি ক্রুসো শিল্পাঞ্চলের একটি ইস্পাত ঢালাই কারখানায়। অল্প কিছু কাল কাজ করার পরেই অবশ্য আবার জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে প্যারিসে একটি নোটারি কোম্পানিতে আইন পড়তে চলে যান।

এত সব বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে লেখক হওয়ার ইচ্ছাটুকু তিনি বরাবরই জিইয়ে রেখেছিলেন। Conference La Bruyère নামে একটি ঐতিহ্যশালী ছাত্র সংসদের সভ্য ছিলেন পুঢোম। এই সঙ্ঘের সভ্যদের প্রোৎসাহে তিনি কবিতা লেখার বিশেষ প্রেরণা পান। যুক্ত হয়েছিলেন পাহনেস কবি-গোষ্ঠীর সঙ্গেও। এবং কবি সংসদের সভ্যদের প্রোৎসাহ এবং উদ্দীপনায় শেষ পর্যন্ত লেখক হওয়ার পথেই চলে গেলেন পাকাপাকি ভাবে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Stances et Poèmes [Stanzas and Poems, 1865]-এর অত্যন্ত অনুকূল সমালোচনা করলেন চার্লস অগাস্টিন, Sainte-Beuve পত্রিকায়। কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন পুঢোম। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের ভাবনার মূলে ছিল তার ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের তিক্ততা এবং নৈরাশ্য। এই বইয়ের Le Vase Brise (The Broken Vase) কবি পুঢোমের সব চেয়ে জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে একটি।

ধীরে ধীরে অনুভূতিপ্রবণ লেখার থেকে সরে এসে এক নিজস্ব স্টাইলে লিখতে শুরু করেন পুঢোম। যদিও পুঢোমের কবিতার শরীর থেকে এই মেলানকলি কখনোই সম্পূর্ণ ভাবে চলে যায় নি। পাহনেস কবি গোষ্ঠীর লিকন্ত দেলিল (Leconte de Lisle) পুঢোমের কবিতা পছন্দ করতেন। কিন্তু পুঢোম যে শুধু ব্যাক্তিগত দুঃখের কথাই লিখে চলেছেন এতে তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। ক্রমশ পাহনেস-এর প্রথাগত শৈলীর সঙ্গে নিজের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে মিলিয়ে লিখতে শুরু করলেন পুঢোম। এ ক্ষেত্রে তাঁর এক বিশাল প্রেরণা ছিল রোমান দার্শনিক ও কবি লুক্রেতিয়াস-এর দে রেরুম নাতুরা (De rerum natura, 1878-79) যার প্রথম বইটি পুঢোম অনুবাদ করেন ফরাসী কবিতায়। লুক্রেতিয়াস তার এপিকিউরিয়ান দর্শন অনুপ্রাণিত কবিতায় বলছেন, "মানুষের জীবন কিছু সুস্থ নীতি দ্বারাই চালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অল্পে সন্তুষ্ট থাকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ"। পুঢোমের কবিতায়ও এই দর্শনের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই লা জুসতিস (La Justice , 1878, "Justice") গ্রন্থে।

ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে, মিলিশিয়াতে নাম লেখান পুঢোম, প্যারিসকে আক্রমণ থেকে বাঁচাতে সৃষ্টি হয়েছিল এই সশস্ত্র গোষ্ঠীর। জাতির এই তীব্র সঙ্কট নিয়ে কবি লিখলেন Impressions de la guerre [Impressions of War], প্রকাশিত হল ১৮৭০ সালে। একই বছরে কবি হারালেন তার মা, কাকা এবং কাকিমাকে এবং নিজে আক্রান্ত হলে পক্ষাঘাতে। শরীরের নিবাংশ অকেজো হয়ে গেলো তাঁর এবং এই সমস্যায় এর পর আজীবন ভুগেছেন তিনি। তাঁর সে সময়ের কাজের মধ্যে ছিল Les Vaines Tendresses [Vain Endearments, 1875] এবং Le Zenith [1875]। তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত, ৪০০০ লাইনের লে বনেয় (Le Bonheur , 1888, "Happiness") কাব্যগ্রন্থ। ফস্টিয় (Faust) প্রেম ও জ্ঞানের সন্ধান দ্বারা অনুপ্রাণিত, এই গ্রন্থটি ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং দর্শনের মেলবন্ধন করে একটি নতুন কবিতাধারা সৃষ্টি করার এক অনন্য প্রয়াস। যদিও, এই গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত ন্যূনতম রচনা শৈলীর সমালোচকেরা কড়া সমালোচনা করলেন। বলা হল এই অস্বাভাবিক পরিমিতির ফলে লেখাগুলি সঠিক অর্থে কবিতা বা দর্শন, কোনটাই হয়ে ওঠে নি।

Le Bonheur -এর পরে পুঢোম কিন্তু কবিতা থেকে সরে যান সৌন্দর্যতত্ত্ব, কবিতার দর্শন এবং অন্যান্য দার্শনিক প্রবন্ধ রচনার দিকে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য L'Expression dans les beaux-arts (Expression in the fine arts, 1884), Testament Poétique (Poetic Testament, 1901) এবং Réflexions sur l'art des vers

(Reflections on the art of verses, 1892)। Testament Poétique গ্রন্থে তিনি, একই সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন মুক্ত কাব্য (Free verse) এবং প্রতীকীবাদ, উভয়ের বিরুদ্ধেই। এ ছাড়া La Revue des Deux Mondes পত্রিকায় ফরাসী বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, আবিষ্কারক ব্লেইজ প্যাসকেলের ওপর রচনা করেন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ। এর মধ্যে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত La Vraie Religion Selon Pascal (True Religion According to Pascal) প্রবন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে পাস্কেলের মতবাদ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন তিনি।

ফরাসী শারীরবৃত্তবিদ চার্লস রিকে-কে উদ্দেশ করে চিঠির বয়ানে লেখা সুল্লি পুঢোমের সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় Le problème des causes finales (The Problem of Final Causes, 1902) গ্রন্থে। একই গ্রন্থে ছাপা হল রিকের লেখা L'effort vers la vie et la théorie des causes finales প্রবন্ধটিও। পুঢোমের যে ডারউইনিজম এবং ল্যামারকিজম সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ছিল, তা তাঁর যুক্তিপ্রসঙ্গ আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল এই বইয়ে। কিছু ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার গভীরতা রিকের লেখাকেও ছাপিয়ে গেছে বলে মনে করেন অনেকে। Revue de métaphysique et de morale জার্নালে প্রকাশিত তাঁর শেষ কাজ La Psychologie du Libre-Arbitre, [free will, 1906) এ পুঢোম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, বললেন মানুষই তাঁর জীবনের অধিকর্তা। জীবনের স্রোত মোটেও পূর্বনির্ধারিত নয়।

জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় নানা রোগে ভুগেছেন। শেষ জীবনে একলা জীবন কাটাতে চলে এলেন Châtenay-Malabry-তে । একের পর এক অনেকগুলি পক্ষাঘাতের আক্রমণ সত্ত্বেও লেখা থামান নি কখনো। অবশেষে মৃত্যু এল, অতর্কিতে ৬৮ বছর বয়েসে।

জনমানসে কবির স্থানঃ

১৮৬৫ সালে প্রকাশিত পুঢোমের প্রথম কাব্যগ্রন্থের Le vasa brise (the broken vase) কবিতাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যুদ্ধের পটভূমিকায় যুদ্ধ ও সংঘাত নিয়ে পুঢোম লিখলেন La France and Impressions de la gurre. সাধারণ মানুষের সে লেখাও পছন্দ হয়। Conference La Bruyère নামে একটি ঐতিহ্যশালী ছাত্র সংসদের সভ্য ছিলেন সাআলি। এই সঙ্ঘের সভ্যদের প্রোৎসাহে তিনি কবিতা লেখার বিশেষ প্রেরণা পান। ১৮৮১ সালে সালি Académie française-এর সভ্য নির্বাচিত হন এবং ১৮৯৫ সালে Chevalier de la Légion d'honneur সম্মানে ভূষিত হন।

সুল্লি প্রুঢুমের তিনটি কবিতায় সুর করে দিয়েছিলেন গ্যাব্রিয়েল ফোঘে। এর মধ্যে Les Vaines tendresses গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'Au bord de l'eau' (At the Water's Edge), ও Stances et poèmes বইটি থেকে Les Berceaux' (The Cradles) গানদুটি ফরাসী দেশের কালজয়ী গান বলে পরিগণিত হয়।

ট্রিভিয়াঃ

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের প্রথম প্রাপক পুঢোম। পুরস্কারের প্রায় সবটুকু অর্থ ব্যয় করেন Société des gens de lettres দ্বারা প্রদত্ত একটি কবিতার পুরস্কার চালু করতে। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন Société des poètes français, Jose-Maria de Heredia এবং Leon Dierx-এর সঙ্গে।

তাঁর নোবেল পাওয়া নিয়ে সে সময়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সুইডিশ নাট্যকার, কবি ও লেখক অগাস্ট স্ট্রীন্ডবার্গ সহ বেশ কিছু লেখক এবং শিল্পী পুঢোমকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, পুরস্কার লিও তলস্তয়কে দেওয়া উচিৎ ছিল। স্ট্রীন্ডবার্গ নিজে যদিও পান নি, কিন্তু তাঁর দেশের কবি সেলমা লগেরলফ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন ১৯০৯ সালে। নোবেল কমিটির দ্বারা অবহেলিত সমসাময়িক লেখকের দলে রয়েছেন এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২), আন্টন শেখভ (১৮৬০-১৯০৪) এবং হেনরি জেমসও (১৮৪৩-১৯১৬)।

অনুদিত কবিতাগুলি নিয়ে কিছু কথা:

প্রুঢমের কবিতার যে দুটি বৈশিষ্ট্য, মেলানকলি এবং এপিকিউরিয় দর্শনত্বত্ত্ব, অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে দেখতে পাই কোথায় যেন একটি আনন্দের সুরও লেগে রয়েছে। ব্যথার, বিচ্ছেদের, হারিয়ে যাওয়ার আবহের আড়ালে, বহতা জীবনের অসীম আনন্দকে, ক্ষণিকের প্রাপ্তির সুরে ধরে ফেলা ইচ্ছে টুকু লেগে রয়েছে।

"এই পৃথিবী" কবিতায় জীবনের নশ্বরতার কথা বলা হয়েছে। পাখির গান, ফুলের ফুটে ওঠা, প্রেমিকার ঠোঁটের চনমনে চুমু সব কিছুই ফুরিয়ে যায়, হারিয়ে ফেলে উজ্জ্বলতা। এবং জীবনের অজস্র সংগ্রামে, কষ্টে ব্যথাতুর মানুষ শুধুই শোকের ছায়ায় ডুবে ডুবে যায় এই হারানোর খেলায়। কিন্তু তাও মানুষ স্বপ্ন দেখে চিরন্তনের। এই ইচ্ছাটুকুই জীবন তো। স্বপ্ন বই কিছুই না।

জীবন আদতে খুব সহজ কিন্তু মানুষ পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায় নানা জটিলতায়, হারিয়ে ফেলে তার সহজ আনন্দের উপচার। On The Water কবিতায় কবি প্রবহমান জলের রূপকল্পে জীবনকে বর্ণনা করেছেন। এবং এক অদ্ভুত নিরাসক্তির কথা আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। বলছেন, চির বহমানা নদী, তার অন্তহীন চলার পথের অজস্র জনপদ, নদীর বুকে বয়ে চলা নৌকা সবাই যে যার নিজের বয়ে চলায় ব্যস্ত। ভেসে চলা ফুল কি জানে সে কোথা থেকে এসে পড়েছে এই জলে, বা কোথায় গিয়ে শেষ হবে তার চলা? অথচ চলেছে সবাই। থামা নেই, ভাবনার কোন সুযোগ নেই, ভাবনার কোন দিগদর্শী উপযোগিতা নেই। তাই শেষ স্তবকে কবি বলছেন, কেন মানুষের চলা এরকম দ্বিধাহীন হতে পারে না! সহজ ইচ্ছার ফুলগুলি ফুটে উঠুক না, ঝরে যাক না! যেমন নদী চলছে, নদীর তীর চলছে, আকাশের মেঘ চলছে, মানুষের জীবনও বয়ে যাক না; সরলতায়, সমর্পণে, ভালবাসায়। খুব জেনে, বুঝে কিছু হবে কি, হয় কি ?

তৃতীয় কবিতা, "জলের ধারে" একটি শুদ্ধ ভালবাসার কবিতা। যখন দুটি প্রাণের প্রেম যুক্ত হয়, তখন সমস্ত পৃথিবী থেমে যায়, সমস্ত ছবি যেন যুগলবন্দী হয়ে দেখা দেয় দু-জোড়া প্রেমের চোখে। কোথাও কোন বিচ্ছেদ নেই, তাল-কাটা নেই। শুধু স্বচ্ছ, স্পষ্ট অবগাহন, প্রেমের পবিত্র জলে, জীবন নদীর ধারে...

গ্রন্থ সমূহঃ

সন	গ্রন্থ	কবিতা/গদ্য
১৮৬৫	Stances et poems (Stanzas and Poems)	কবিতা
১৮৬৬	Les Épreuves (The Trials)	কবিতা
১৮৬৬	Les Écuries d'Augias [The Augean Stables, 1866)	কবিতা
১৮৬৬-১৮৬৮	Croquis Italiens [Italian Notebook]	কবিতা
১৮৬৯	Les Solitudes [Solitude]	কবিতা
১৮৭০	Impressions de la guerre [Impressions of War]	কবিতা
১৮৭২	Les Destins [Destinies]	কবিতা
১৮৭২	La Révolte des fleurs [Revolt of the Flowers]	কবিতা
১৮৭৪	La France [France]	কবিতা
১৮৭৫	Le Zenith	কবিতা
১৮৭৫	Les Vaines Tendresses (1875) [Vain Endearments]	কবিতা
১৮৭৭	Poésies de Sully Prudhomme	কবিতা

সন	গ্রন্থ	কবিতা/গদ্য
১৮৭৮	La Justice [Justice]	কবিতা
১৮৭২-১৮৭৮, ১৮৭৯	Poésies de Sully Prudhomme	কবিতা
১৮৮৬	Le prisme, poésies diverses [The prism, various poems]	কবিতা
১৮৯১	The problems of Good, Freedom and Immortality	গদ্য
১৮৯২	Réflexions Sur L'art Des Vers	গদ্য
১৮৮৮	Le Bonheur [Happiness]	কবিতা
১৮৯৬	Que sais-je? [philosophy]	গদ্য
১৮৮৮-১৯০৮	Œuvres (8 vols.)	কবিতা/গদ্য
১৯০০-১৯০১	Œuvres de Sully Prudhomme (6 vols.)	কবিতা/গদ্য
১৯০১	Testament poétique [essays]	গদ্য
১৯০২	Le Probleme Des Causes Finales (with Charles Richet)	গদ্য
১৯০৫	La vraie religion selon Pascal [True religion according to Pascal]	গদ্য
১৯০৬	Psychologie du Libre Arbitre	গদ্য
১৯০৮	Les Epaves [Flotsam]	কবিতা
১৯২২	Journal Intime - Lettres - Pensees	কবিতা
১৯২৬	Oeuvres de Sully Prudhomme (5 vols.)	কবিতা/গদ্য
১৯৭৮	Solitudes	কবিতা
১৮৬৬-১৮৭২, ২০০১	Poésies de Sully Prudhomme	কবিতা
২০১৪	Poésies posthumes	কবিতা
১৮৮৩-১৯০৮	Œuvres de Sully Prudhomme [poetry and prose], 8 volumes, A. Lemerre	গদ্য
১৯২২	Journal intime: lettres-pensée [Diary: thought-letters]	গদ্য

সুত্রপঞ্জি

1. My Poetic Side Bio: https://mypoeticside.com/poets/sully-prudhomme-poems
2. Nobel.org life sketch: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1901/prudhomme/facts/
3. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sully_Prudhomme
4. Authors calender: http://authorscalendar.info/prudhomm.htm
5. Encyclopedia: https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/prudhomme-sully

   Britannica: https://www.britannica.com/biography/Sully-Prudhomme

কবিতা ও অনুবাদ

In This World

In this world all the flow'rs wither,
The sweet songs of the birds are brief;
I dream of summers that will last
Always!

In this world the lips touch but lightly,
And no taste of sweetness remains;
I dream of a kiss that will last
Always.

In this world ev'ry man is mourning
His lost friendship or his lost love;
I dream of fond lovers abiding
Always!

এই পৃথিবী

এই পৃথিবীর সকল কুসুম, ঝরবে ওরা,
বিচিত্র গান পাখির সুরে, সেও ফুরোবে;
স্বপ্ন শুধু বসন্ত চায় জীবন জুড়ে।
সমস্ত দিন।

জ্বলন্ত ঠোঁট চুমুর নেশায়, আলতো ছোঁওয়ার,
মধুর নেশা তেমন কই আর আগের মত?
নিবিড় চুমুর স্বপ্ন শুধু পড়ছে উড়ে।
সমস্ত দিন।

ভ্রান্ত জীবন, নিজের শোকেই মগ্ন মানুষ,
স্বজন-হারা শ্মশান কিম্বা প্রেমের কাঁটা।
স্বপ্ন আমার, প্রেম-আগুনেই যাক না পুড়ে!
সমস্ত দিন।

On The Water

The sound of bank and water is all I hear,
The sad resignation of a weeping spring
Or a rock that hourly sheds a tear,
And the birch leaves' vague quivering.

I do not see the river bear the boat along
The flowering shore flits past, and I remain;
And in the watery depths that I skim,
The reflected blue sky flutters like a curtain.

Meandering in their sleep, you might say the waters
Waver, no longer sure where the bank lies:
And the flower thrown in hesitates to choose.
And like this flower, all that man desires

Can settle on the river of my life,
Without teaching me which way my wishes lie.

Sully Prudhomme (1839-1907)

ভেসে থাকা জলে

নদীতীর কাঁদে, কুলুকুলু স্বর, জলেরও শুনি।
বিষণ্ন মন, এক নির্জন ঝর্ণা নিরাশ।
একলা পাথর সে কেন ঝরায় অশ্রুর বারি?
কেন পলাশের পাতায় কাঁপছে হাওয়ার তরাস ?

নাও চলে নিজে, নদী সে কি আর বয়ে চলে তাকে ?
আমি বসে দেখি, দ্রুত পিছুগামী, তীর ফুলে-ঢাকা;
নদীবুকে জল, গভীর অতল, সেখানে দেখেছি
পড়ে থাকে ছায়া, নীল নভতল, যেন যবনিকা।

যেন আঁকাবাঁকা স্বপ্ন-রুপোলী, ঘুমে-ঘেরা রাত,
পথভোলা নদী, জানে না সে তীর, কোথায় ঠিকানা।
ছেঁড়া ফুলও ভাসে, মৃদু অনায়াসে, তবু সে আলগা
তারই মত যদি হত মানুষেরও সকল কামনা,

জড়ো হত এসে, এই জলে ভেসে, জীবনের নদী
বয়ে যাওয়া সুখে, বিনা-অভীষ্ট, দিগদর্শিতা !

At The Water's Edge

To sit and watch the wavelets as they flow
Two - side by side;
To see the gliding clouds that come and
And mark them glide;

If from low roofs the smoke is wreathing pale,
To watch it wreath;
If flowers around breathe perfume on the gale,
To feel them breathe;

If the bee sips the honeyed fruit that glistens,
To sip the dew;
If the bird warbles while the forest listens,
To listen too;

Beneath the willow where the brook is singing,
To hear its song;
Nor feel, while round us that sweet dream is clinging
The hours too long;

To know one only deep over mastering passion –
The love we share;
To let the world go worrying in its fashion
Without one care –

We only, while around all weary grow,
Unwearied stand,
And midst the fickle changes others knows,
Love - hand in hand

জলের ধারে

এই যে তীরে বসে, ঢেউয়ের ভেঙে যাওয়া দেখা,
যুগল ঢেউ পাশাপাশি;
এই যে ভাসে মেঘ, রোদের ঝিলিমিলি মাখা
ওদের দ্রুত ভাসা ভাসি।

এই যে চিমনির, ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকে
কেমন মালা গড়ে ওঠে
ফুলের মত ওরা, সুবাসে ভরে দেয় হাওয়া
সুরভি নিঃশ্বাস ফোটে।

এই যে মৌমাছি, মধুপে গুঞ্জন করে
সে মধু মেখে নেওয়া ঠোঁটে,
এই যে পাখি গায়, নিরালা বনভূমি শোনে
মনে সে গুঞ্জন ওঠে।

তমাল তরুতল, যেখানে কুলুকুল নদী
সে গান মরমের তীরে
অথচ ঘিরে থাকে, স্বপ্ন-সোনা নিরবধি
ছোঁবে যে সময়ের ভীড়ে –

তাকেই জানা শুধু, হৃদয়-গাঢ় অনুরাগে
মরমি প্রেম নেয় চিনে।
জীবন চলে যায়, ব্যস্ত সময়ের রাগে –
তবু সে উদ্বেগ বিনে –

আমরা থেমে থাকি, দুদিকে অনাদির স্রোতে
জীবন যায় ভেসে ভেসে...
সে সব ভাঙ্গাগড়া এড়িয়ে হাতে হাত রেখে
আমরা যাই ভালবেসে।

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

শ্যামলী আচার্য

সুখপাখি

(৪)

“আপনের পোলায় ব্যাবাক্কের লগে অ্যাকছের কাইজ্যা বাজায়।”

এইরকম নালিশ নতুন নয়। পোলাপান মানুষ। দুষ্টুমি তো করবেই। কিন্তু দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বেড়ানোটা মোটেই ভালো কথা নয়। বনমালী চিন্তিত হলেন। দুহাইররা রৌদে বাড়ি ফিরে ফুলুর সম্পর্কে রোজ কিছু না কিছু শুনতেই হয় বনমালীকে। ছাওয়ালটা দিনকে দিন দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ করে তুলছে। কারও কথা শোনে না। তার মায়ের অসুস্থতার কারণে তাকে জোরদার শাসন করার উপায় নেই। কেউ সামান্য কিছু বললেই অন্য আরও পাঁচজন চারধার থেকে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে।

“আহারে! মায়ের যতনটুকও পাইল না। ছ্যামড়াডার কপালটাই ফাডা।”

বিনোদিনী নিজে পারতপক্ষে নালিশ করেন না। তিনি কম কথার মানুষ। গলার স্বর শুনতে পায় না কেউ। কিন্তু তাঁর আদেশ অনুরোধ বা অনুমতির স্বর খুব স্পষ্ট। বাড়িতে কামলা, লশকর, মাহিন্দরের ভিড়। দাসী-চাকর কুটুম পরিজন প্রত্যেকে ফুলুকে নিয়ে তটস্থ। সচেতন বিনোদিনীও। সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখেন। নানান কাজের ফাঁকে তাঁর একটা কান আর একটা চোখ ফুলুর দিকে। সতীনপো বলে কথা। আদর যত্ন নজর করবে না কেউ। কিন্তু সামান্য অবহেলায় ত্রুটি ধরার জন্য কুটুমেরা মুখিয়ে আছে। প্রত্যেকের জিভে খুরের শান দেওয়া।

“আমার লগে অরে অ্যাকবার দ্যাখা করতে কইয়ো।”

খাবারের আসনে বসে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বনমালী বলেন। অন্দরের কোনও বয়স্কা পিসি বা খুড়ি হবেন। সরাসরি রক্তের সম্বন্ধ নয়। জ্ঞাতি-গুষ্টির কেউ। সংসারে নালিশের লোকের অভাব হয় না।

“কাল কইলাম, তোর বাফে তোরে বোলাইতে লাগজে। ছ্যাত কইর‍্যা যা। শোনলে তো! অরে বিছরাইতে বিছরাইতে মোর পরান বাইরাইয়া যায়।”

ফুলুকে স্কুলে পাঠানো দরকার এবার। অন্তত কিছুক্ষণ উদ্দণ্ডপানা থেকে রেহাই। পড়ায় মন দিলে অন্যদিকে সময় পাবে না। বনমালী ভাবেন, গ্যারেট সায়েবের ইশকুলটাই ভালো। আজকের স্কুল তো নয়। বনমালীর জন্মেরও প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার স্কুল। শ্রীরামপুর মিশন তখন এই ইস্কুলটি তৈরিতে সাহায্য করে। সেই সময় মিশনারীরা এগিয়ে না এলে বাঙালি তার টোল আর চতুস্পাঠীতেই বাঁধা পড়ে থাকত। কলকাতায় তখন রাজা রামমোহন রায় লড়াই করছেন ইংরাজি শিক্ষা প্রচার আর প্রসারের লক্ষ্যে। তাঁর সঙ্গে শহুরে শিক্ষিত মানুষেরাও রয়েছেন। একের পর এক ইস্কুল কলেজ হয়েছে বইকি। কিছু কিছু কানে এসেছে বনমালীর। শ্রীরামপুরের পরে খ্রিস্টান মিশনারীরা ফিরে তাকালেন বরিশালে। শুরু করলেন তাঁদের প্রচারকেন্দ্র। প্রাথমিক এবং অন্যতম উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার। তাঁদের ভজনালয়ে সহজেই আকৃষ্ট হল সাধারণ মানুষ। নিম্নশ্রেণির অশিক্ষিত নমঃশূদ্র তখন দয়ালু পাদ্রীদের আশ্রয়ে। আসলে প্রভু যীশুর চেয়েও সামনে দাঁড়ানো পাদ্রীদের মধুর ব্যবহার তাদের আর্থিক অসাম্যের ক্ষতস্থানে মলমের মতো প্রলেপ বুলিয়েছিল। তাঁরাই তখন হাতের নাগালে পাওয়া ভগবান। শিক্ষার আগেও দরকার খাদ্য। পেটের ভাত পরনের কাপড় আর নিশ্চিন্ত ঠাঁই। কিন্তু নিশ্চিত অন্নের আশ্বাসের

চেয়েও কখনও কখনও বড় হয়ে ওঠে সম্মান। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে এই প্রাপ্য সম্মান দিয়েই একেবারে আপন করে নিল মিশনারীরা।

ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করেন বনমালী। দিনকাল দ্রুত বদলাচ্ছে। ব্যবসাপত্র, মামলা-মোকদ্দমা, সরকারি যে কোনও নির্দেশনামা অনুসরণ করতে হলে নিজে ইংরেজি জানা ছাড়া গতি নেই। অন্যের উপর নির্ভর করে রোজকার কাজ চলে না। তাঁর ফরিদপুর থেকে বরিশাল চলে আসার পিছনেও সেই একই কারণ। সঠিক পথে উচ্চশিক্ষা। নিজে তো বটেই, নিজের ভাই এবং ভাইপোকেও এল এম এফ পাশ করতে উৎসাহিত করেছেন। সংক্ষেপে এল এম এফ। পুরো ডিগ্রির নাম লাইসেন্সিয়েট অফ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি। সহজে বললে ডাক্তার। ঢাকার মিডফোর্ড হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ব্রিটিশ রাজত্বের এই উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে বনমালী দু'বার ভাবেননি। শুধু মেধা নয়, তাঁর দূরদর্শিতা এবং দরদী মন নিয়েই তিনি চিকিৎসকের পেশা বেছে নেন। মানুষের পাশে থাকতে হবে। দেশের নিরন্ন দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেই হবে। অশ্বিনীকুমার ঘোষের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে এক অন্য জাগরণের সূচনা দেখছে বরিশাল। বনমালীও এই যজ্ঞে সামিল হতে চান মনেপ্রাণে।

ফুলুর স্কুল নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন বনমালী। খেতে বসেও তাঁর মাথা কাজ করতে থাকে দ্রুত।

বরিশাল জেলার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এন ডব্লিউ গ্যারেট। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন, বরিশাল বিভাগে তাঁর উদ্যোগ ছাড়া 'বরিশাল ইংলিশ স্কুল' তৈরিই হত না। লোকের মুখে মুখে ফিরত 'গ্যারেট সাহেবের ইস্কুল'-এর নাম। তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন জন স্মিথ। সেই সময় মাত্র আটজন ছাত্র নিয়ে স্কুল শুরু হয়েছিল। সাহেবের দম ছিল বটে। এলাকার লোকজনকে এককাট্টা করে সেই বছরই ইস্কুলে ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়াল সাতাশ।

বনমালী নিজেও দেখেননি স্কুলটির পুরনো চেহারা। দেখা সম্ভবও নয়। তখন তাঁর জন্মই হয়নি। এই অঞ্চলের এক সম্পন্ন অর্থবান মানুষের জমিতে প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জার পশ্চিম দিকে ছিল আদি স্কুলটি। পরে স্পেনসার নামের এক ইংরেজের জমিতে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। শোনা যায়, স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন ই বার্টন। তাঁর ক্রমাগত তাগাদায় আর উৎসাহে অঞ্চলের সমস্ত ধনী মানুষজন প্রায় আটত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা তোলেন স্কুলের উন্নতির জন্য।

জলাজঙ্গলে আকীর্ণ ভূখণ্ডের মানুষগুলো সেই আঠারো দশকের গোড়াতেই আঁকড়ে ধরেছিল শিক্ষার আলো। ঐ আলোর পথেই তাদের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয় ক্রমশ। অবিভক্ত বাংলার অন্য জেলা তখনও শিক্ষার প্রশ্নে কয়েক যোজন পিছিয়ে। সেই স্কুলটিই এবার জিলা স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। বনমালী তাঁর প্রথম সন্তানটিকে সেই স্কুলেই ভর্তি করতে মনস্থির করলেন।

"ফুলুর দৌরাত্মি কমবে এইবার। ধম্মের ষাঁড় হওনের আগেই... । অরে কাল ইস্কুলে ভরতি করুম। নয়া বউরে কও, পুরোইত মশাইরে ডাকন লাগবে। বেইন্নাহালেই রওয়ানা লাগে।"

স্বগতোক্তি করেন বনমালী। বংশের প্রথম সন্তান। গাঙ্গুলী বংশের রক্তে অধ্যয়নের বীজ। ফরিদপুরের মহিমামহিম গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবারে সকলেই পরিশ্রমী। প্রতিটি সন্তান স্বশিক্ষিত। বনমালী তাঁর প্রথম সন্তান রমাপ্রসন্ন গাঙ্গুলীকেও উচ্চশিক্ষিত দেখতে চান। অন্তত তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে তাঁর কঠোর দৃষ্টি।

"বেরজোমোহন স্কুলে দিবেন না ক্যান ?"

বিনোদিনী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেন একবার। পিতার নামে ব্রজমোহন স্কুল সদ্য তৈরি করেছেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান এই মানুষটিকে দেশ হিতৈষী বললে কম বলা হয়।

বনমালী বিনোদিনীর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। জনদরদী এই নেতার প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত অশ্বিনীকুমারের স্কুলে তিনি নিজের ছেলেকে পাঠাবেন না। তার চেয়ে মিশনারীও শ্রেয়।

"নয়া বউ, কাইল তুমি ফুলুর সঙ্গে থাকবা। আমার মন কয়, স্কুল যাওন শুরু করলেই শুধরাইয়া যাইব। কাইল বেরাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা য্যান থাকে। শুভ কাজ অ্যাকখান। ত্রুটি না হয়।"

সাত্ত্বিক মানুষটি তাঁর নয়াবউয়ের ওপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। এই স্ত্রী ঘরে আসার পর থেকেই তাঁর প্রতিপত্তি বেড়েছে, আর্থিক উন্নতি হয়েছে কয়েকশোগুণ। বিনোদিনী তাঁর কাছে পয়মন্ত। যত আয় বেড়েছে তত পাল্লা দিয়ে পুজো, ব্রত আর সেই উপলক্ষ্যে লোক খাওয়ানোর প্রচলন শুরু হয়েছে বাড়িতে। নানান প্রথা বাড়ছে ক্রমশ। বনমালী চান, আরও মানুষ আসুন। কোনও ছাত্র যেন অর্থের অভাবে পড়া না ছাড়ে, কোনও দরিদ্র মানুষ যেন সাহায্য চেয়ে ফিরে না যায়।

"নয়া বউ, পানের ডিবায় আইজ গোটাকয় পান বেশি দিও।" অন্য প্রসঙ্গে কথা বলে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করে উঠে পড়েন বনমালী। এখন একটু গড়িয়ে নেওয়া। রোদের তাপ কমলে কাঠপট্টি যাওয়া। অনেক কাজ বাকি। নতুন ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে পুরোদমে।

বাড়িতে সারাদিন চাকর-বাওন, অতিথ-অইভ্যাগত লেগেই আছে। বিশমণি-পঁচিশমণি নৌকা এসে নামে বাড়ির ঘাটে। বিনোদিনীর কঠোর দেখভাল। অনেক কাজের একফাঁকে বড়সতীনকেও খাইয়ে আসেন। নিজের হাতে থালায় বেড়ে নিয়ে যান। হাত ধরে বসিয়ে খাওয়ান। ফ্যালফ্যাল করে চায় সুনয়নী। বনমালী গাঙ্গুলীর প্রথম পক্ষ। আপন-পরের বোধ হারিয়ে যায় তাঁর। এক-একসময় উন্মত্ত হয়ে ভাঙচুর করতে যান সবকিছু। তখন কেবলই সন্দেহ করেন, নিশ্চই কেউ বিষ মিশিয়ে দেবে তাঁর খাবারে। সুনয়নীর পরিত্রাহি চিৎকারে কান্নায় অন্দরমহল ভারী হয়ে ওঠে। বুকফাটা আর্তনাদ। একমাত্র বিনোদিনীকে ভরসা করেন তিনি। কী এক অজ্ঞাত কারণে বিনোদিনী সামনে এসে দাঁড়ালেই সুনয়নী ঠাণ্ডা হয়ে যান। তাঁর সব উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়। অনেকেই দেখেছে খেয়েদেয়ে বিনোদিনীর কোলের কাছেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন সুনয়নী। হাতের মুঠোয় বিনোদিনীর আঁচলের খুঁট। বিনোদিনী সারাদুপুর ঠায় বসে। সেইদিন আর খাওয়া হয়নি তাঁর। সতীন তো নয়, যেন এক অবুঝ দামাল সন্তান। তাকে নাইয়ে-খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবে তাঁর পরিতৃপ্তি।

"নয়াবউরে এইবার বাপের বাড়ি পাঠানো লাগব।"

পাখার বাতাস করে যে অনুগত সহায়ক, তাকেই বলেন বনমালী।

সন্তানসম্ভবা স্ত্রীয়ের কোনও অযত্ন তিনি হতে দেবেন না। অন্তত এই পক্ষের প্রথম সন্তানটি নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে আসুক।

(৫)

চন্দ্রদ্বীপ। নামের মধ্যেই কেমন মায়া জড়ানো। কিন্তু দ্বীপ বলতে যা বোঝায়, চন্দ্রদ্বীপ সেইরকম নয়। নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যে এক একলা ভুবন। শুধু নদী, উপনদী, খাল আর সোঁতা ... চারপাশে ঘিরে ধরে ভূখণ্ডকে। কাটাকুটি চলে অবিরত। নিঃসঙ্গ নির্জন নদীপথে একা মাঝির ভাটিয়ালী সুর।

ব্যস্ত শহরে ঢুকে ইমনের নিঃশ্বাস নিতেও ইচ্ছে করছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল, সময় নষ্ট হচ্ছে। অমরমামা অপেক্ষা করছিলেন নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ডে। গাড়ি দাঁড় করানো। অমরমামার গাড়িতে ওঠামাত্রই ইমন প্রশ্ন করে, "বনমালী গাঙ্গুলীর বাড়িটা তো এখন সদর গার্লস স্কুলের হোস্টেল, তাই না?"

"হ। কাইল নিয়া যামু তোমারে। কিন্তু তুমি তো আরও অনেক কোশ্চেন রেডি কইর‍্যা আনসো, তোমার খাতাপত্তর নিয়া আয়্যাই যখন পড়সো, চিন্তা নাই। সব ঘুরাইয়া দ্যাখাইয়া দিমু হনে।"

ইমন লক্ষ্য করে অমরমামার কথায় বরিশালের সেই আগ্নেয় ভাষার ঝাঁজ কম। বরিশাল মানেই খরখরে ধারালো তেজ। অমরমামার আপ্যায়ণে নাগরিক পরিশীলনের ছাপ স্পষ্ট। ধার কমিয়ে পালিশ করে ঢাকাই বাংলায় কথা বলছেন এঁরা।

"হ্যাঁ। তা' এনেছি বইকি। প্রশ্ন আছে, কিছু খোঁজখবর নেবার আছে, ঘুরে দেখার দরকার তো বটেই।"

"আগে চলো, তোমারে মুকুন্দদাসের মন্দিরখান দ্যাখাইয়া লই। পথেই পড়ব। আইজ আর ভিতরে যামু না।"

"সেই আদি মন্দিরের জায়গাজমি অনেকটাই দখল হয়ে গেছে না ?" কথাটা বলেই অপ্রস্তুত হয়ে যায় ইমন। দেশ ভাগাভাগি, জমিজায়গার বাঁটোয়ারা হবার পরেও এই দেশ তছনছ হয়েছে কতবার। ধর্ম আর মৌলবাদ কত ইতিহাস লোপাট করে দেয় ...। সেই রক্তাক্ত ইতিহাস বড় বেদনার। যা ছিল, তার অনেককিছুই এখন স্মৃতি। যা রয়েছে, তার সঙ্গে অনেক যন্ত্রণা।

"বরিশালের ইতিহাস-ভূগোল তুমি সব গুলাইয়া খাইয়্যা আইসো শোনলাম।"

"তা' আমি কিছু মুখস্থ করেছি বলতে পারো। আসল ইতিহাসের কথা বলবে তোমরা। যেমন ধরো, বইতে লেখা আছে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় তখন মুসলমান আধিপত্য। রাজা দনুজমর্দন প্রতিষ্ঠা করলেন একটি স্বাধীন রাজ্য, 'চন্দ্রদ্বীপ'। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ অঞ্চল 'বাকলা' নামে পরিচিত ছিল। 'বাকলা' কথাটির মানে হল, শস্য ব্যবসায়ী। এই শব্দটি আবার আরবী।"

"এই বাকলা বন্দরখান কে বানাইলেন জানো তো ?"

ইমন একটু থমকায়। অনেক কিছুই স্মৃতিতে ধরে রেখেছে সে। মাঝেমধ্যে নোটবুক খুলতে হয় যদিও।

"মামা, আমার যদ্দূর মনে পড়ছে, ড. কানুনগো নামে কেউ একজন এই বাকলা বন্দর তৈরি করেন। এই সামুদ্রিক বন্দরে তখন আরব ও পারস্যের বণিকরা বাণিজ্য করতে আসতেন। খুব প্রাচীন বৈদেশিক মানচিত্রে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামটি বড় বড় করে লেখা রয়েছে দেখা যায়। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ জেলা বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। আর ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে বাকেরগঞ্জ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ সালে জেলার সদর দপ্তর বাকেরগঞ্জ জেলাকে বরিশালে স্থানান্তরিত করা হয়। বরিশাল তখন গ্রেট বন্দর।"

"হ। আমাগো বরিশালিয়া ভাষায় গিরদে বন্দর।"

অমরমামার কথায় হেসে ফেলে ইমন। এই 'গিরদে' শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে বেশ সময় লেগেছিল ওর। 'গ্রেট' শব্দের অপভ্রংশ যে ব্যকরণের কোন নিয়মে গিরদে হতে পারে, তা' বোঝা দুষ্কর।

বরিশালের ভাষার অন্যরকম মজা। স্বরধ্বনি থাকলে যে অপিনিহিতি হয়, সেই নীতি তবু মেনে নেওয়া যায়; রাখিয়া থেকে রাইখ্যা, করিয়া থেকে কইর‍্যা, আজি থেকে আইজ অবধি ঠিক আছে। কিন্তু শব্দের শুরুতে স-এর জায়গায় 'হ' বসানো, 'র'-এর জায়গায় 'ল', 'ল'-এর জায়গায় 'ন' ... যদিও এগুলো খুবই খুঁটিনাটি ব্যাপার। সব জেলার ভাষাতেই কিছু নিজস্ব শব্দভাণ্ডার আর কথনরীতি থেকেই যায়। কিন্তু বরিশালিয়া ভাষা আর কথা বলার ভঙ্গি বড় মারাত্মক। যেমন তেজ, তেমন ঝাঁজ।

গাড়ির জানালায় ছুটে যায় এক জনবহুল শহর। মোটরগাড়ির ইঞ্জিন, রিকশার হর্ন, সাইকেল আর পায়ে হাঁটা মানুষের শব্দে একের পর এক নতুন অনুরণন। সেই ধান-নদী-খাল আর এখন কোথায় ? যে তিন মিলিয়ে বরিশাল। বরিশালের

নামকরণ নিয়ে কত মতভেদ। কেউ বলেন, বড় বড় শালগাছের কারণে বরিশাল; ইমন একজায়গায় পড়েছে পর্তুগীজ বেরী ও শেলীর প্রেম কাহিনীর জন্য বরিশাল; আবার কেউ বলেন, বড় বড় লবণের গোলার জন্য বরিশাল। ওই যে সেই গিরদে বন্দরে মানে, গ্রেট বন্দরের অপভ্রংশ, সেই বন্দরে নাকি ঢাকার নবাবদের বিশাল বড় বড় লবণের চৌকি ছিল। এই জেলার লবণের বড় বড় চৌকি আর লবণের বড় বড় দানার জন্য ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকরা এ অঞ্চলকে 'বরিসল্ট' বলত। এ বরিসল্ট পরিবর্তিত হয়ে বরিশাল হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। আঠারো শতকের প্রথম দিকে বরিশালের ইতিহাসের কিংবদন্তি পুরুষ আগা বাকেরের আবির্ভাব ঘটে। নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন তখন আগা বাকের সেলিমাবাদ পরগণার সাড়ে এগার আনি এবং বুজর্গ উমেদপুর সম্পূর্ণ অধিকার করেন। তার নামেই তখন এই জেলার নাম হয়েছিল বাকেরগঞ্জ।

"আচ্ছা, আগা বাকেরের কোনও মূর্তি বা ছবি আছে এখানে ? কোনও মিউজিয়মে বা ওইরকম ..."

ইমনের প্রশ্নে গাড়ির সামনের সীট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকান অমর পুশিলাল।

"নাঃ। আমি যদ্দূর জানি, অমন কিসু আর নাই। থাকার কথাও না। অতকাল আগের ইতিহাস, কেই বা জমাইয়া রাখে...। এই দ্যাশডার উপর দিয়া ঝড়ঝাপটা কিছু কম গেল নাকি ! তুমি যাগো লিগ্যা আইসো, দ্যাখো তাদেরই আর কিসু অবশিষ্ট আসে কিনা ...", বলতে বলতেই ডানদিকে হাতের ইশারা করেন অমর।

"ওই দ্যাখো আমাগো কীর্তনখোলা। দেইখ্যা লও। প্রাণ ভইরা দেইখ্যা লও। কাইল আবার আসুম অখন। আইজ যাওয়ার পথে দ্যাখো ..."

কীর্তনখোলা। এক নদীর নাম।

পদ্মা থেকে আড়িয়াল খাঁ নদ। সেই নদ থেকে কীর্তনখোলার জন্ম। শায়েস্তাবাদ থেকে গজালিয়ার কাছে গিয়ে এই নদী পড়েছে গাবখান খালে। বরিশাল ঘেঁষে এগিয়েছে আরও পশ্চিমে। বয়ে গেছে নলছিটি থানার পাশ দিয়ে। এরই একটি অংশের নাম ধানসিড়ি। ভাবতে ইমনের গায়ে কাঁটা দেয়। কীর্তনখোলা আর তার বুক থেকে খসে পড়া ধানসিড়ি। বরিশাল জেলার সঙ্গে দুটি নদীর নাম কেমন নূপুরের মতো রিনরিন করে।

"মামা, কীর্তনখোলার নাম এইরকম কেন ?"

"তুমি অ্যাতো পড়ালিখা কইর‍্যা শ্যাষে আমারে এইসব জিগাইলা ?"

"সব কথা তো ইতিহাস বইতে লেখা থাকে না। আর ইতিহাস মানে তো শুধু শুকনো পুঁথির পাতা নয় ..." ইমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। গাড়িটা থেমেছে কিছুক্ষণের জন্য। গাড়ির জানলা দিয়ে যতটুকু দেখা যায়, বাঁধানো রাস্তার ধারে নদীপথ। শহরের মধ্যে দ্রষ্টব্য স্থান বৈকি। এইদিকটা সুন্দর সাজানো। গাছপালা ঘেরা। সিমেন্টের বেঞ্চি। বসার জায়গা। হাঁটার জায়গা। দিব্যি ঝকঝকে পরিষ্কার। এই নদীর তীরে বিখ্যাত নৌ-বন্দর। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী বন্দর। কালের চিহ্ন সর্বাঙ্গে। দেখেই বোঝা যায় তার পুরনো শরীর এখন শীর্ণ। যৌবনের সেই উদ্দামতা আর অবশিষ্ট নেই। চারপাশে উন্নয়নের জোয়ারে তার শরীরে নেমে এসেছে বার্ধক্য।

নদীর পাড় ঘেঁষে রয়েছে শহরের পুরনো হাট। সবচেয়ে প্রাচীন। হাটে কীর্তনের উৎসব লেগে থাকত প্রায়ই। হাটখোলায় স্থায়ী আস্তানা করে বসবাস করত কীর্তনিয়ার দল। হয়ত সেইরকমই কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে নদীর নাম কীর্তনখোলা।

"বরিশাল মানেই শুনেছি চারদিকে শুধু জল আর জল। খাল বিল পুকুর আর নদী। ভাবলেই কেমন অস্থির লাগে। মানুষ তখন যাতায়াত করত কী করে?"

ইমনের স্বগতোক্তি শুনে হাসেন অমর।

“অ্যাতো কিছু পইড়্যা আইসো, আর এইটুক জানো না, বরিশাল হইল বাংলার ভেনিস ?”

দু’জনে দুজনের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হেসে ওঠে। ভেনিসই বটে। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যেতেও তখন নৌকা লাগত। রেললাইন পাতার জন্য ঠিকঠাক জায়গা পাওয়া গেল না!

জলের দেশ হবে না’ই বা কেন ? দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পলি জমে গড়ে ওঠা কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে এই অঞ্চল। প্রাচীনকালে সাতটি শাখায় ভাগ হওয়া গঙ্গার একটি দিক ছিল পাবণী পূর্বগামী শাখা। পূর্বগামী ত্রিধারার মিলিত স্থানকে সুগন্ধা বলা হতো। এই সুগন্ধা নদীর বুকে গঙ্গার পলিমাটি নিয়ে অসংখ্য দ্বীপ সৃষ্টি হয়। অনেক দ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায় ইতিহাসে। কালের বিবর্তনে চাঁদের মতো দেখতে এই দ্বীপগুলোর সম্মিলিত নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ।

ভাবতে ভাবতেই গাড়ি এগোতে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ক্লান্ত লাগছে এখন। প্রথম কাজ অমরমামার বাসায় গিয়ে হাতমুখ ধোওয়া। বড় ধুলো রাস্তায়। চায়ের তেষ্টা চাগাড় দেয়। সেই কাকভোরে মনুকাকা চা করে খাইয়েছিলেন। এখন এক কাপ চা না পেলে চলবেই না ইমনের। চা খেতে খেতে গুছিয়ে নিতে হবে কালকের প্ল্যান। কোথা থেকে ঘুরতে শুরু করবে ইমন ... সেই বাড়ি ?

(৬)

‘জনসাধারণের সভা’। এইরকমই নাম দিয়েছেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। কাঠের বাক্স পেতে নিয়েছেন একখানা। তার ওপর দাঁড়িয়েই বলে চলেছেন একনাগাড়ে। মাঝেমধ্যে থামেন। জ্বালাময়ী ভাষণের মাঝে গান ধরে সুরথ কীর্তনীয়া। সুরথ কীর্তন গায়। কিন্তু তথাকথিত ভক্তিমূলক গান নয়। সুরথের গানের মধ্যে মিশে থাকে সমাজ বদলের কথা। ইংরেজ শাসন শোষণ আর অবিচারের কথা। খুব সুকৌশলে সুললিত ভাষায় দারুণ সুরেলা গলায় গায়। কীর্তনখোলা নদীর ধারে ভিড় জমছে ক্রমশ। সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই অশ্বিনীকুমারকে দেখছেন বনমালী। আশ্চর্য জনমোহিনী ক্ষমতা এই মানুষটির। বনমালী দাঁড়িয়ে পড়েন মাঝেমধ্যে। গান শোনেন। কথা শোনেন। সততা আর দৃঢ়তায় গড়া মানুষটির সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কখনও কোনও অন্যায় করতেই পারবে না। এমনই আদর্শের দীপ্তি তাঁর মধ্যে।

অশ্বিনীকুমারের বাবা ব্রজমোহন পেশায় ছিলেন সাব-জজ। স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ তিনি। তাঁরই চেষ্টায় পটুয়াখালিতে একটি সাব-ডিভিশন তৈরি হয়। এখানে মুন্সেফ ছিলেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বরিশালের পটুয়াখালি মহকুমায় গৌরনদী উপজেলা। সেই জেলার মধ্যেই বাটাজোড় গ্রাম। বরিশাল শহর থেকে আঠারো মাইল উত্তরে। এই গ্রামেই জন্ম ব্রজমোহনের এই কৃতী সন্তানের। চার ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে অশ্বিনী সবচেয়ে বড়। মা প্রসন্নময়ী ছিলেন বানারীপাড়ার গুহ বংশের কন্যা। রাধাকিশোর গুহর কন্যা প্রসন্নময়ী নিজেও অত্যন্ত শিক্ষিত এবং মনেপ্রাণে প্রগতিশীল। প্রথম জীবনে বানারীপাড়ায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন ব্রজমোহন। রাধাকিশোরের জহুরীর চোখ। কন্যা প্রসন্নময়ীর জন্য ব্রজমোহনের মতো উপযুক্ত পাত্রকে তিনি হাতছাড়া করেননি।

বানারীপাড়াতে উচ্চ বিদ্যালয় বা ইউনিয়ন ইন্সটিটিউশন তৈরির বহু আগে থেকেই বাড়িতে বাড়িতে টোলে বা গৃহশিক্ষকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার রেওয়াজ। প্রসন্নময়ী অন্দরমহলে বসেই পড়তে শিখেছিলেন। কিন্তু লেখার হাত আর তৈরি করা হয়নি। মেয়েমানুষের এইটুকু দুর্ভাগ্য মেনে নিয়েই এগিয়ে চলতে হয়। শ্রুতিধর মায়ের কোলে এই বাটাজোড়ে অশ্বিনীর জন্ম ১৮৫৬ সালে। ব্রিটিশ রাজত্বে প্রথম সংগঠিত আন্দোলন হিসেবে সিপাহী বিদ্রোহ তখনও অঙ্কুরে। তেমন করে বিপ্লব দানা বেঁধে ওঠেনি। কিন্তু বিধাতা বোধহয় জন্মমুহূর্ত থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখেন এক একজন মহাত্মার গতিপথ। এক যুগসন্ধিক্ষণেই অশ্বিনী এসে দাঁড়ালেন বরিশালে।

ব্রজমোহনের কর্মস্থল ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় হওয়ার সূত্রে ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে জেলা ইস্কুলে পড়তে হয়েছে অশ্বিনীকে। কোথাও শিকড় গেঁথে দীর্ঘদিন থাকতে হয়নি। বরিশালের ভাষাও তাঁকে তেমন জড়িয়ে ধরেনি। তুলনামূলক এক পরিশীলিত বাংলায় তাঁর অনায়াস যাতায়াত। ব্রজমোহন দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করতে করতে মুন্সেফ হন। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট। শেষ পর্যন্ত জজ হয়েছিলেন ব্রজমোহন।

বাটাজোড় গ্রামে জমিদারির গোমস্তা নীলকমল সরকারের কাছে তালপাতায় তার হাতে খড়ি। বিষ্ণুপুর, রংপুরের সরকারি স্কুলে প্রথাগত পড়াশোনা। চোদ্দ বছর বয়সেই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য একেবারে তৈরি অশ্বিনী।

অস্থিরভাবে পায়চারি করেন ব্রজমোহন। মেধাবী পুত্র তাঁর। এই বয়সেই তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি আর শাণিত মেধায় তাক লাগিয়ে দিয়েছে শিক্ষকদের। শুধুমাত্র বয়সের সীমায় আটকে যাচ্ছে তার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র।

সমাধান দিলেন রত্নগর্ভা মা প্রসন্নময়ী।

"এত উচাটন হওয়া লাগে না। আপনে বড় পোলারে পরীক্ষায় বসাইবেন যখন মন করসেন, তহন আর আর মত বদলের দরকারডা কি ?"

"তোমার মতখান কও দেহি", পেশায় জজিয়তি করলেও ব্রজমোহন তাঁর স্ত্রীর বিচারবুদ্ধির প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন।

"কমু আর কি ... চৌদ্দরে সতেরো করা তো তোমাগো উকিল ম্যাজিস্টরের বাও হাতের কাম। খাতায় বয়স বাড়াইয়া লেইখ্যা দ্যাও হনে ... অর সব পড়া ব্যাবাক তৈয়ার আসে।"

প্রসন্নময়ীর পরামর্শে মনে মনে স্বস্তিলাভ করেন ব্রজমোহন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী সতেরো বছরের আগে পরীক্ষায় বসতে পারবে না অশ্বিনী। এদিকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় চোদ্দ বছরেই সে তার প্রথাগত শিক্ষা সম্পূর্ণ করে পরীক্ষার জন্য টগবগ করে ফুটছে। তার এই আকুল জ্ঞানস্পৃহার জন্য শ্লাঘা বোধ করেন ব্রজমোহন। নিয়মের বেড়াজালে আটকালে তার এই পড়ার নেশা কোনদিকে বাঁক নেবে বলা মুশকিল। ওকালতির পেশায় নিরন্তর মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় ঠিকই। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মানুষ তিনি। মনে মনে পৈতৃক ভিটার দূর্গামন্দিরের আটচালায় দাঁড়িয়ে বীজমন্ত্র জপ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনের প্রথম পরীক্ষায় ছলনার আশ্রয় নিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। প্রসন্নময়ীর সমর্থনে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। বদলির চাকরিতে বারে বারে বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত। অশ্বিনী যখন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত, তখন অহেতুক কালক্ষেপ করার মানে হয় না। রংপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন অশ্বিনী।

বাটাজোড়ের দত্তবাড়িতে উৎসব সেদিন। কুলদেবতাকে পুজো দিয়ে একশো ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করেছেন প্রসন্নময়ী।

অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রস্তুত হন প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ এ ক্লাসে ভর্তির জন্য। এবার তার গন্তব্য কলকাতা। সত্তরের কলকাতা। তবে এই সত্তর অষ্টাদশ শতকের সত্তর।

....

মামীমার হাতের ইলিশমাছ ভাজা, ইলিশের ঝোল আর ইলিশ ভাপা খেয়ে উঠে ইমনের কেমন অপরাধবোধ হল। এত ভাত একসঙ্গে সে সারাজীবনেও খায়নি। বরিশালের বালম চাল আর মসুর ডালের গল্প শুনলেও ইলিশে বিখ্যাত এই অঞ্চলে এসে প্রাথমিকভাবে তার এই রূপোলি শস্যের সঙ্গেই পরিচয় ঘটল প্রথম।

ভাতের থালা শেষ করে চূড়ান্ত হাঁসফাঁস অবস্থা হয় ইমনের। এরপর আর কাজ করা যায় কোনও ? এদিকে ওর প্ল্যান প্রচুর। ভেবেছিল বিকেলে শহরে ঢুকেই একটা চক্কর দিয়ে নেবে চারপাশে। এত খাবার পরে আপাতত সেই চিন্তা ত্যাগ করতেই হচ্ছে।

নিরালা একটি ঘর বরাদ্দ হয়েছে ইমনের জন্য। পাশের জানালা দিয়ে খোলা উঠোন চোখে পড়ে। মাটির উনুন একটি। সদ্য নতুন বানানো রয়েছে। রান্নাঘরে গ্যাসের আঁচেই রান্নার ব্যবস্থা। তবুও কিছু প্রাচীনতা এই শহরের বাড়িটিতেও ভরপুর। বাড়ির পিছনদিকে একটি ছোট পুকুর। সন্ধের আঁধারে পুকুরের কিনারায় ঝুঁকে পড়া অচেনা গাছের সারি দেখে বড্ড মনকেমন করে। পুকুরের চারপাশে কত লতাগুল্ম। এই তার দেশ। জন্মভূমি নয়, কিন্তু হতেও পারত।

"পেন্নাম হই বউঠান"।

হঠাৎ সম্বোধনে চমকে ওঠে ইমন।

দরজার কাছে ঝকঝকে চোখের এক উজ্জ্বল যুবক। বুকের কাছে হাতজোড়। ঠোঁটে এক চিলতে ফাজিল হাসি।

ইমন অবাক চোখে তাকিয়ে হাতজোড় করে। অনভ্যাস যদিও। হাই-হ্যালো করা প্রাত্যহিকতা একটু ধাক্কা খায় কোথাও।

পেছনেই অমরমামার গলা।

"ভাগ্নী, এ হইল মনিরুদ্দিন। আমার ভাইয়ের পোলা। তুমি কইলকাতা থিক্যা আইসো শুইন্যা তোমার লগে আলাপ করতে আইসে।"

মনিরুদ্দিনের হাতদুটি তখনও বুকের কাছেই জোড় করা। মুখের হাসিটি চওড়া হচ্ছে ক্রমশ। জোড়া ভুরুর তলায় উজ্জ্বল দুটি চোখ। ইমন হেসে ফেলে। "আসুন আসুন"।

"এই কাম সারসে! বউঠান আমারে পর কইর্যান দিসে ... আপনি-আজ্ঞে ছাড়েন, আমি বয়সে খাটো আপনার থিক্যা। তুমি কন, তুই কইলেও হয়।"

মনিরুদ্দিনের ভরাট গলা আর দরাজ হাসিতে কাছের মানুষের গন্ধ। বড় আপন মনে হয়। "আচ্ছা বেশ। তাই হবে। তুমিই বলব। কিন্তু 'বউঠান' কেন ?"

"বা রে, চাচায় যে কইল, ইন্ডিয়া থিক্যা তার ভাগ্নী আইব, বরিশাল নিয়া তারে অনেক ডাকখোঁজ দিতে লাগব, ভাবলাম মেহমান তো নন। এই পাড়ায় পড়শিও তো হইতে পারতাম আমরা। তহন কি আর নাম ধইর‍্যা ডাক দিতাম ? আপনেই ক'ন, আপা কওনের চাইতে বউঠান শোনতে বেশি মিঠা লাগে না ?"

ইমনের চোখের কোনটা জ্বালা করতে থাকে। ছেলেটির কথায় বরিশালের টানের চেয়ে ঢাকার বাংলা স্পষ্ট। তবুও, সে হতে পারত ইমনের প্রতিবেশি। একই কলেজের জুনিয়র, একই স্কুলের ছাত্র, একই পাড়ার বাসিন্দা। যে কোনও কিছু। পরিচয়ের কি শেষ আছে ? কী এক অদৃশ্য সীমানা সবকিছু ওলটপালট করে দিল।

"আমি ইমন। তুমি আমায় বউঠান বোলো। দারুণ লাগছে শুনতে। আমি তোমায় মণি বলে ডাকব, কেমন ?"

"ইয়া! পাইসি অ্যাকখান নাম!" ছেলেটা লাফিয়ে ওঠে একেবারে। ছেলেমানুষি যায়নি এখনও।

অমরমামা ঘরে আসেন।

“বোজলা ভাগ্নী, মনির কিন্তু ছুটি পাইসে দিন পনেরোর। সদ্য বাসায় আইসে পুনা থিক্যা। আমাগো কপাল না তোমার, হেয়া কইতে পারি না, ও আইস্যা ইস্তক তোমার লগে ঘোরনের লিগ্যা খ্যাপসে। আমি একদিকে চিন্তামুক্ত। মনির তোমার লগে থাকলে আমাগো এই বুড়াবয়সে আর শহরে ঘুইর্যা বেড়াইতে হইব না। মনিরের ঘাড়ে তোমায় চাপাইয়্যা আমরাও ব্যাবাক নিশ্চিন্ত।”

“আমিও চাচা। বউঠানের লগে একটু দ্যাশের কথা কইতে পারুম। এদিক-সিদিক যাওয়াই হয় না কতকাল। অ বউঠান, চাচায় কয় আপনে কীসব খুঁইজ্যা বেড়াইবেন ... আমারে নিবেন তো? দ্যাখেন, সঙ্গী নাপসন্দ হইলে সব মাটি।”

ইমন জানালার দিকে তাকায় একবার। মণি সঙ্গে থাকলে আরও দ্রুত শহরের আনাচেকানাচে ঘুরতে পারবে সে। একদিকে ভালোই হল। অমরমামার বয়স হয়েছে। মামীও ঘরোয়া মানুষ। এঁদের নিয়ে সর্বত্র দৌড়ে বেড়ানোটা কোনও কাজের কথা নয়। আবার একা একা সব জায়গা চিনে উঠতে পারবে না সে। তার চেয়ে মণির মতো একজনকেই তার দরকার ছিল।

“মণি, আমার প্রচুর কাজ। অনেকগুলো জায়গা দেখতে হবে। নিজের চোখে না দেখলে শান্তি পাচ্ছি না। জানি, অনেককিছুই হারিয়ে গেছে, ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়ে গেছে, তবু। আমি শিকড় খুঁজতে এসেছি। আর সেইসঙ্গে একটা হারিয়ে যাওয়া মানুষ। যার কথা ইতিহাসে লেখা নেই।”

“আমি এইহানেই থাকি বউঠান। ওই জানালার ধার দিয়ে তাকাইলেই আমাগো বাসা। হাঁক পাড়লেই হইব। আর হাঁক না পাড়লেও ঠিক ট্যার পামু। দ্যাশের মানুষের টানই এমন। আপনি শুধু কইবেন কোথায় কীভাবে যাইবেন। আমি অ্যাক্কেরে রেডি।”

“তুমি কী এখন খুব ব্যস্ত মণি?”

ইমন জিগ্যেস করেই ভাবে, ও কি প্রথম আলাপেই ছেলেটির ওপর অধিকার ফলাচ্ছে ? কিন্তু ওর হাতে যে বেশি সময় নেই।

“ক্যান বউঠান ? কিছু আনার লাগব ?”

“আরে না না। কিচ্ছু আনতে হবে না। বোসো তুমি। মামীমা এত খাইয়েছেন, আমার অবস্থা খুব শোচনীয়। এক্ষুনি বেরোতেও পারব না। তার চেয়ে তোমার কাছ থেকে এই দেশের গল্প শুনি বরং।”

মণি একগাল হেসে বসে পড়ে খাটের এক কোনায়। এতক্ষণে চোখে পড়ে ওর পরনের কালো টি-শার্টে সাদা রঙে লেখা ‘সব কাজে হাত লাগাই মোরা’।

“বরিশালের কতটা ইতিহাস আপনে জানেন, কন বউঠান। তারপর আমার পালা। দেহি, অ্যাকখান কালচারাল এক্সচেঞ্জ কইর্যাপ লই।”

মামীমা শঙ্খ বাজাচ্ছেন। তুলসীতলা ওই পুকুরের ধারেই। ছোট্ট পিতলের প্রদীপের আলোয় উঠোনে আলোছায়ার আল্পনা।

“ইতিহাস কোথায় লেখা থাকে আমি জানি না গো। ইতিহাসে সন তারিখ থাকে। ইতিহাসে ম্যাপ থাকে, রাজার নাম থাকে, জমিদারের নাম থাকে, শাসক আর শোষকের নাম থাকে। কিন্তু প্রজার কথা থাকে না। আমি প্রজাদের খুঁজছি। একজন মানুষকে খুঁজছি, যিনি কাজ করেছেন গরিব-দুঃখীর জন্য। তাঁর জন্ম ১৮৬২। অথচ তাঁর কাজের কথা ইতিহাসে নেই।”

“আঠারোশো বাষট্টি! অদ্ভুত সময় বউঠান।”

“হ্যাঁ জানি। সাতান্নয় সিপাহী বিদ্রোহ। তার ঠিক আগের বছর বরিশাল পেয়েছে তার অন্যতম রূপকার অশ্বিনী কুমার দত্তকে। একষট্টিতে কলকাতায় জন্ম নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আর ঠিক চৌষট্টি সালে আর এক প্রলয়ংকর ঝড়ে কেঁপে উঠছে এই অঞ্চল।”

মণি গালে হাত দিয়ে শোনে। “ঝড় তো এই দ্যাশের নিত্যসঙ্গী। হেয়া আর নতুন কথা কী ?”

“তা ঠিক। তবে যদি বাংলার কোনও জেলার স্বতন্ত্র ইতিহাস থাকে, সে কিন্তু বরিশাল। এত দৃঢ়চেতা এবং আত্মনিষ্ঠ বাঙালি আর কোনও জেলায় নেই। চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের নেতৃত্বে থেকেও বরাবর স্বাধীনচেতা। দক্ষিণ উপকূল মানেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ঝড় মানেই টর্নেডো, হারিকেন, আর জলোচ্ছ্বাস মানেই সব ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। অদ্ভুত এক অসম লড়াই। প্রত্যেকবার হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি। তবুও আবার ঘুরে দাঁড়ানো। এই সব হারিয়েও ঘুরে দাঁড়ানো, প্রত্যেকবার শূন্য থেকে শুরু করার নামই বরিশাল।”

“আপনে বাষট্টি সালের কথা কি কইতে আসিলেন ?”

ইমন একবার থামে। বহুবার পড়েছে সে। তারপর শুধু খুঁজে বেড়ানো। খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মতো। জন্মের সাল কেউ লিখে রাখত না তখন। শুধু মনে রেখেছিল এক জৈষ্ঠের ঝড়ের কথা। বাষট্টি সালের আঠারোই মে এমনই এক ঝড়ে কেঁপে উঠেছিল দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এখনও দেড়শো বছর আগের সেই কালান্তক ঝড় নিয়ে ছড়া ফেরে লোকের মুখে।

তালগাছে বিড়ালের ছাও শালিক নেয়ট পাড়ে
কত মানুষের গরু মারা গেল জৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে।

এমনই ছিল সেই ঝড়ের দাপট। এই দাপটের মধ্যেই জন্ম তাঁর। লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া বাড়িতে দালানকোঠায় এককোনায় ছিল আঁতুড়ঘর। শিশুটি বেঁচে থাকে ওই প্রবল দুর্যোগে। চারদিক প্লাবিত। যতদূর চোখ যায়, শুধু জল আর জল। বাড়ির নিত্য পূজিত শালগ্রাম শিলা আঁকড়ে ছিলেন মহামহিম। শিশুটির নাম রাখেন বনমালী। আরাধ্য দেবতা ঘরে এসে যেন পরিবারটিকে ধনেপ্রাণে রক্ষা করেন।

(চলবে)

শ্যামলী আচার্য – কর্মসূত্রে ‘আজকাল’, ‘আবার যুগান্তর’, ‘খবর ৩৬৫’ ও অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকায় এবং ওয়েবজিনে ফিচার এবং কভারস্টোরি লেখার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। ‘একদিন’ পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে কাজের সুযোগ। গাংচিল প্রকাশনা থেকে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন ‘অসমাপ্ত চিত্রনাট্য’; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, এই সময়, তথ্যকেন্দ্র পত্রিকায় প্রকাশিত। “রা” প্রকাশন থেকে তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন ‘প্রেমের ১২টা’; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, একদিন, প্রাত্যহিক খবর এবং বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। বহুস্বর পত্রিকার পক্ষ থেকে মৌলিক গল্প রচনায় ‘অনন্তকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার’। অভিযান পাবলিশার্স আয়োজিত মহাভারতের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক গল্প রচনায় প্রথম পুরস্কার। এছাড়াও গবেষণাঋদ্ধ বই ‘শান্তিনিকেতন’। প্রকাশক ‘দাঁড়াবার জায়গা’। ১৯৯৮ সাল থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এফ এম রেইনবো (১০৭ মেগাহার্তজ) ও এফ এম গোল্ড প্রচারতরঙ্গে বাংলা অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের ভয়েস ওভার আর্টিস্ট।

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ১১

[পূর্ব কথাঃ – রঘুর বাৎসরিক পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, সেদিন বিকেলে নিখিলেশ তার স্কুল জীবনের মাস্টার মশাই, বীরেশ্বর মল্লিকের সাথে দেখা করতে এল। সঙ্গে ছিল তার ভাগ্নী আনন্দী। রঘু তখন মাস্টারমশাই এর বাড়িতেই ছিল। আনন্দীকে দেখে রঘুর মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসে রইল। সেখান থেকে সে বকুলকে ফোন করল। বকুল খুশী মনে তার আর প্রমোদের ভবিষ্যতের সংসার সাজানোর কথা বলল। যতক্ষণে রঘু আবার বাড়ি ফিরল, নিখিলেশরা ততক্ষনে সেখান থেকে চলে গেছে।

পরদিন রঘু চা-ঘরে ফিরে জানতে পারল, তার অনুপস্থিতিতে সেখানে জুয়ার আড্ডা বসত। ওদিকে, রেজাল্ট বেরোনোর পর নতুন ক্লাসের পড়া শুরু হল। একদিন ইংরেজি কোচিং ক্লাসের পর রাস্তায় রঘুর পথ আটকে আনন্দী জানাল সে তাব আগের ব্যবহারের জন্য খুব দুঃখিত। রঘুর দিকে সে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল।]

রাত তেমন বেশি হয়নি। কিন্তু জিতেন দাস আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চাইছিল। ক'দিন ধরে রমলার শরীরটা একটু বেশীই খারাপ হয়েছে। এমনিতেও রমলা আজকাল প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকে। তবু তারই মধ্যে উঠে ঘরের মধ্যে একটু ঘোরাঘুরি, টুকটাক কাজ করছিল। কিন্তু এই ক'দিন ধরে রোজ একটু একটু জ্বর আসছে। শরীরে যেন একটুও বল নেই। একেবারে শয্যা নিয়েছে। নেহাৎ সরযূ আছে বাড়িতে! নাহলে জিতেন যে কি করে কি করত, জানে না।

অথচ এই রমলাই আগে কী সুন্দর, প্রাণচঞ্চল একটা মেয়ে ছিল। ঘরের কাজ, রান্না বাড়া, বাবানকে সামলানো – সবই একা হাতে করত। কোনদিন ওর মুখে চোখে জিতেন ক্লান্তি বা বিরক্তি দেখেনি। কত আনন্দে ছিল ওরা! তারপর, হঠাৎ কি যে হল! মাত্র ক'দিনের জ্বরে বাবান ওদের ছেড়ে চলে গেল। জিতেন আর রমলার পৃথিবীটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। আঘাতটা সামলাতে অনেক সময় লেগেছিল। তবু জিতেন একসময় উঠে দাঁড়ালো। আবার জীবনের পথে চলতে শুরু করাল। কিন্তু রমলার শরীর মন সেই যে ভেঙ্গে গেল, তা আর জোড়া লাগল না! খারাপ হতে হতে এমন অবস্থা যে এখন শয্যাশায়ী। বুকটা ভারী হয়ে আসে জিতেনের। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আঠারো বছর আগে বাবান তাদের ছেড়ে চলে গেছে। তখন সে ছিল চোদ্দ বছরের একটা চনমনে কিশোর। বেঁচে থাকলে এতদিনে তার বিয়ে হয়ে যেত। জিতেনের একটা নাতি বা নাতনীও থাকতে পারত! ওর ঠোঁটের কোণে একটা করুণ হাসি ফুটে ওঠে। চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকাল সে। দুজন খরিদ্দার দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ওদের সামনে বাদল দাঁড়িয়ে আছে।

চা-ঘরে এখন আর কোনো খরিদ্দার নেই। রান্নাঘরে মুরারী ওদের রাতের রান্না শুরু করেছে। নিতাই ওকে জোগান দিতে দিতে গুনগুন করে একটা কীর্তন গাইছে। রঘু এখনও কোচিং ক্লাস থেকে ফেরেনি। ঘরে বসেই জিতেন কাঁচের দরজার ওপাশে মিহির দত্তকে দেখতে পেল। এদিকেই আসছে। মাঝ পথে দাঁড়িয়ে বাদলকে কিছু জিজ্ঞেস করল। বাদল মাথা নাড়ল।

মিহির দত্ত ঝুনঝুনওয়ালার ম্যানেজার। জিতেন দাস ওকে চেনে। এর আগেও ও দুবার জিতেনের কাছে এসেছে। ওরা ওদের রেসর্টের জন্য চা-ঘরের জমিটা কিনতে চায়। বলছে, ভালো দাম দেবে! আগের দিনই জিতেন বলে দিয়েছে – সে 'চা-ঘর' বিক্রি করবে না। এই দোকান তার কাছে শুধু রুজি রোজগারের পথ নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু! বাবান চলে যাওয়ার পর থেকে সে তো এই দোকানটা নিয়েই বেঁচে আছে। ছোট্ট সাদা-মাটা দোকানটাকে একটু একটু করে বড় করেছে। এখন এই দোকান থেকে শুধু তার একার নয়, আরও কতগুলো মানুষের অন্নসংস্থান হয়! আশপাশের কত লোক রোজ এখানে আসে, চা-টা খায়, গল্প-সল্প করে – জিতেনেরও তো ভালো লাগে সেটা! বড় রাস্তার উপরে হওয়ায় পথ চলতি

লোকেরাও এখানে বসে একটু জিরোয়, চা খেয়ে গলা ভেজায়, খাবার দাবারও খায়। তাহলে, এখন একটা রেসর্ট হবে বলেই এই চা-ঘর তুলে দেবার কোনো মানে হয়?

মনে যাই থাকুক, মিহির দত্ত চা-ঘরে আসতেই জিতেন তাকে 'আসুন আসুন' করে আপ্যায়ন করল, বসতেও বলল। কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলে ঘুরে ফিরে আবারও সেই চা-ঘর বিক্রির কথা বলল মিহির। আরো কিছু লোভনীয় প্রস্তাব দিল। বলল, চা-ঘরের জমির ভালো দাম তো জিতেন পেয়েই যাবে, সেই সাথে রেসর্টে যে একটা স্ন্যাকস্‌বার বানানো হবে, জিতেন চাইলে তাকে সেটার ম্যানেজার করে দেওয়া হবে। চুপ চাপ সব কথা শুনে জিতেন দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল – 'আমাকে মাপ করবেন মিহিরবাবু, আমাকে এবার উঠতে হবে। আমার স্ত্রীর শরীরটা ভালো নেই! আমার বাড়ি যাওয়া দরকার।' জিতেন চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ানোতে মিহির দত্তও 'অবশ্যই, অবশ্যই!' বলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল – 'তবে দাসমশাই, আমাদের প্রস্তাবটা মেনে নেওয়াটাই আপনার পক্ষে ভাল হবে! বলা যায়না তো, কিসের থেকে কি হয়!' জিতেন দাসের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল! কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না!

ক্যাশের টাকা গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে জিতেন ডাক দিল – 'সীতারাম, কই রে? আয় এদিকে। চল, বাড়ি যাব।' ক্যাশ টাকা সঙ্গে থাকে, তাই সীতারাম রোজ বাইকে করে জিতেন দাসকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। বেরোনোর মুখে দেখা হল রঘুর সাথে, টিউশন ক্লাস করে ফিরছে। আজকাল রঘুকে দেখলে তার মনটা ভালো হয়ে যায়। নিজের মনে ভাবে জিতেন – ছেলেটা বড় ভালো হয়েছে! বাবা নেই, মা নেই, আগাছার মত বেড়ে উঠেছে। অথচ কী তেজী, মজবুত আর কত বুদ্ধি!

* * *

বাদল লাফাতে লাফাতে রঘুর কাছে এসে বলল – 'এসে গেছে! আবার এসে গেছে।' ওর মুখে চোখে হাসি আর উত্তেজনার ফুল্‌কি ফুটছিল। পাশে দাঁড়ানো বিরজুর মুখেও মিটমিটে একটা দুষ্টু হাসি। রঘু কিছু বুঝতে না পেরে বাদলকে জিজ্ঞাসা করল – 'কি এসে গেছে?'

'সেই লাল গাড়ি। আবার এসে গেছে!' উৎসাহভরে বাইরের দিকে তাকাল বাদল। এবার রঘুও দেখল, আনন্দীদের লাল মারুতিটা চা-ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে, আর সেটা থেকে আনন্দী আর তার মামা নামছে। এর আগেও একদিন ওরা এসেছিল। সেদিন তো ওদের দেখে রঘু রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। সেদিন ওরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে শুধু একটু সময় রঘুর সাথে কথা বলেছিল। আনন্দী বলেছিল, ও আজকাল গাড়ি চালানো শিখছে। এতে ওর বাবার খুব আপত্তি ছিল। কিন্তু মামু বলে কয়ে ওর বাবাকে রাজী করিয়েছে। একথাও বলেছে, আনন্দী যখন ড্রাইভিং শিখবে তখন ড্রাইভারের সাথে মামুও গাড়িতে বসে থাকবে। ওই গাড়ি চালানো শিখছে বলেই আজকাল আনন্দী ছোট মারুতিটা নিয়ে বিকেলের দিকে কালিচকের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারে!

ওদের দেখে রঘু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, ক্যাশ টেবিল ছেড়ে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। ওরাও দুজনে এগিয়ে এসে দুটো চেয়ারে বসে পড়ল। রঘু ভিতরে ভিতরে একটু অবাক হলেও আগ্রহ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল – 'চা খাবেন তো?' নিখিলেশ বা আনন্দীর চা-ঘরের মত জায়গায় চা খেতে আসার কথা নয়! কিন্তু কেন এসেছে, সেটা রঘু ঠিক বুঝতে পারছিল না।

নিখিলেশ বলল – 'চা তো খাবই! তোমাদের দুটো স্পেশাল চা আর এক প্লেট পকোড়া দিতে বল।'

বাদল দৌড়ে এসে অর্ডার লিখে নিয়ে গেল। নিখিলেশ রঘুর দিকে তাকিয়ে বলল – 'তোমার যদি একটু সময় থাকে তো আমাদের সাথে বসে এক কাপ চা খাবে? একটু কথা বলতাম! আসলে সেই কারণেই আমরা এই সময়ে এখানে এসেছি। জানি, এখনও দোকানে খরিদ্দার আসা শুরু হয় নি!'

রঘু সহজ ভাবে বলবার চেষ্টা করে – 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না, কি বলবেন! আমি বসছি।' মুখে একথা বললেও ভিতরের অস্বস্তি সে চেপে রাখতে পারে না। সে জানে, আনন্দীদের সাথে সব ব্যাপারেই তার বিস্তর ফারাক রয়েছে। যদিও বন্ধুত্ব স্বীকার করার পর থেকে আনন্দী তার সঙ্গে আর কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু পুরনো কথা রঘু মোটেই ভুলে যায় নি। ও জানে – এরা রঘুকে – 'বেচারা' বলে দয়া করে, করুণা করে। রঘু এসব চায় না। সে নিজের মতো করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়।

এবার নিখিলেশ সোজা রঘুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল – 'অত কিন্তু কিন্তু করছ কেন রঘু? পাঁচ মিনিটের জন্য বস। আমি বেশি সময় নেব না। আসল কথা কি জানো রঘু, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি বোধহয় জানো না, আমি আর্মিতে ছিলাম। কারগিলের লড়াইয়ে আমি আধখানা পা হারিয়েছি, কিন্তু ফাইটিং স্পিরিটটা হারাইনি!'

রঘু চেয়ারে বসে পড়ল। দুচোখ ভরা শ্রদ্ধা, বিস্ময়, বেদনা নিয়ে সে তাকিয়ে ছিল নিখিলেশের দিকে! গর্বিত মুখে আনন্দী বলল – 'জানিস রঘু, মামু ইজ মাই হীরো! এ রকম মানুষ আমি আর দেখিনি। মামুকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমি এয়ারফোর্সে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাবা আমাকে আজেবাজে একটা এক্সকিউজ দিয়ে সায়েন্সই নিতে দিল না!'

আনন্দীর পিঠে দুটো আদরের চাপড় মেরে তাকে শান্ত করে নিখিলেশ রঘুকে বলল – 'তোমার মধ্যে আমি একটা লড়াকু মানুষ দেখতে পেয়েছি। সেই জন্যই তোমাকে আমার এত ভালো লেগে গেছে। আচ্ছা, এবার আসল কথাটা শোনো – যা বলতে এসেছিলাম। সামনের বুধবার আনন্দীর স্কুল ছুটি আছে। সেদিন আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীটে যাব – বইপত্র কিনব। ওখানেই কোথাও লাঞ্চ করে সারাদিন বেশ মজা করে বিকেলে ফিরে আসব! আগেই বলে দিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। ছুটি নিয়ে নিও।'

নিখিলেশের কথা শুনতে শুনতে রঘু যেন কোথায় চলে গিয়েছিল ! এখন তার কথা শেষ হতেই রঘু আবার বাস্তবের মাটিতে ফিরে এল। বলল – 'কিন্তু আমার তো বইপত্র কিছু কেনার নেই। আমি ওখানে গিয়ে কি করব ?'

'একদম বাজে কথা বলবি না রঘু!' ধমকে উঠল আনন্দী। 'আমি যেন কিছু জানি না! তোর বন্ধুরাই বলেছে, তোর কাছে অর্দ্ধেক বইই নেই। তুই এর ওর বই থেকে ফোটোকপি করে, নোট লিখে লিখে কাজ চালাস। এভাবে পড়ে তুই ভালো রেজাল্ট করতে পারবি? ফালতু কত সময় নষ্ট হয় তোর!'

নিখিলেশ আনন্দীকে সায় দিয়ে বলল – 'না না, রঘু! এ ব্যাপারে আমি আনন্দীর সাথে এক মত। তোমার যা যা বই দরকার, আমাদের সাথে গিয়ে কিনে নেবে বুধবার। তুমি এত ভালো একটা স্টুডেন্ট, তোমাকে তো ভালো রেজাল্ট করতেই হবে! ভালো নম্বর পেলে তবেই তো ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারবে!'

রঘুর মুখটা যেন কেমন হয়ে যায়। মাথাটা নামিয়ে ম্লান হাসি হেসে বলে – 'কলেজ? ভালো কলেজে ভর্তি হব আমি?'

জোর দিয়ে নিখিলেশ বলে – 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভালো কলেজে ভর্তি হবে তুমি।'

মুখটা তুলে অবাক দৃষ্টি মেলে রঘু বলে – 'কি করে ? আমাকে তো কাজ করে খেটে খেতে হয়!'

– 'কি করে, সেটা আমি দেখব। কিন্তু তার আগে এই বুধবার আমরা তিনজন কলেজ স্ট্রীটে বই কিনতে যাব।' কথা শেষ করে নিখিলেশ উঠে দাঁড়ায়।

– 'কিন্তু বই কেনার এত টাকা ... ?'

রঘুকে থামিয়ে দিয়ে নিখিলেশ বলে ওঠে – 'সেটা আমি বুঝব। আমার সঙ্গে যাচ্ছ, টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমায়!'

আনন্দী হাত তালি দিয়ে ওঠে – 'ঠিক হয়েছে। সব কিছুতে শুধু পাকামি! মামুর কাছে তুই জব্দ!'

– 'কিন্তু, আমার বই! আপনি কেন টাকা দেবেন?'

এবার নিখিলেশ গম্ভীর হয়ে গেল – 'কেন দেব না? আমি যেমন আনন্দীর মামা, তেমন তোমারও তো মামা হতে পারি। শোনো রঘু, মানুষই মানুষকে সাহায্য করে। আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনো ভাবে কারো না কারো সাহায্য নিয়েই বেঁচে থাকি। তোমার আত্মসম্মান জ্ঞানকে আমি সম্মান করি, কিন্তু সেটাকে এত বড় একটা 'ইগো ইস্যু' করে তুলো না। ভালোবেসে কেউ কিছু দিতে চাইলে তাকে প্রত্যাখান করা কি ঠিক? আর এত চিন্তার কি আছে? আজ আমি তোমায় সামান্য একটু সাহায্য করছি, পরবর্তী কালে তুমি আমায় সাহায্য করবে।' কথা থামিয়ে রঘুর দিকে তাকিয়ে হাসল নিখিলেশ – 'কি হল? করবে না ?'

– 'আমি আপনাকে সাহায্য করব? পারব কোনোদিন?'

– 'নিশ্চই পারবে। কোনো না কোনো ভাবে ঠিক পারবে।' রঘুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে নিখিলেশ বলল – 'আজ আসি।' হাসিমুখে আনন্দীও গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

নিখিলেশ আর আনন্দী চলে যাওয়ার পর রঘুও নিজের কাজে ফিরে গেল। নিয়মমত সব কিছুই সে করে যেতে লাগল, কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা অচেনা অনুভূতি তাকে কেমন যেন আনমনা করে রাখল! বাদল, বিরজুর বিশেষ ঈঙ্গিতপূর্ণ কথা, মুরারী-নিতাই এর ঠাট্টা বা টিপ্পনি – কিছুই তার গায়ে লাগল না। রঘুর মনে হচ্ছিল, তার এই চা-ঘরের ছকে-বাঁধা জীবনের ছন্দটা যেন পাল্টে যাচ্ছে! দূর থেকে যেন একটা ঢেউ একই সাথে রোমাঞ্চ আর ভয় নিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। আনন্দী আর তার মামুর সঙ্গে এই যোগাযোগটা রঘুর জন্য ভালো না মন্দ হবে, তাও সে বুঝতে পারছিল না।

রঘুর মনের কথা বলার একমাত্র মানুষ অঙ্কিত। রাতে অঙ্কিত পড়তে এলে রঘু তাকে সব কথা একেবারে বিশদে বলল। সব শুনে অঙ্কিত একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ভুরুটা একটু কুঁচকে গম্ভীর ভাবে বলল – 'আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগছে! তোর বই আছে কি নেই, তোর রেজাল্ট ভালো হল কি খারাপ হল, এসব নিয়ে আনন্দীর মামার এত মাথা ব্যথা কিসের? আমার মনে হয় এসবের পিছনে আনন্দীই আসলে কলকাঠি নাড়ছে!'

সারা মুখে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে রঘু অঙ্কিতের কথা শুনতে শুনতে একটু বিচলিত ভাবে বলে উঠল – 'কিন্তু কেন?'

– 'ও যা মেয়ে! ওর পেটে পেটে কি মতলব আছে কে জানে? তোকে না আবার কোনো ঝামেলায় ফেলে দেয় ! জানিস তো, আমি শুনেছি ওর পিছনে ছেলেদের লম্বা লাইন আছে। একে তো বড়লোক বাপের মেয়ে; তার উপরে আবার দেখতেও ভালো! ঘ্যাম ঘ্যাম ছেলেরা সব ওর জন্য ইঁট পেতে রেখেছে। কিন্তু, ও তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে তোর পিছনে ঘুরছে কেন? কিছু তো মতলব আছে ওর!'

রঘু চিন্তিত ভাবে বলে – 'কিন্তু আমাকে যা বলার সবই তো আনন্দীর মামা বলেছে। আনন্দী তো কিছু বলেনি।'

– 'আরে বুঝলি না', অঙ্কিত বোঝায় রঘুকে, 'আসলে আনন্দীই ওর মামাকে ওসব বলতে বলেছে।'

– 'কিন্তু উনি অত বড় একজন মানুষ, আনন্দীর কথা শুনবেন? তোকে বললাম তো, উনি আর্মির লোক। কারগিলের যুদ্ধে নিজের একটা পা হারিয়েছেন। দেশের জন্য হাসিমুখে সেটাও মেনে নিয়েছেন। এরকম একজন ...?'

– 'আরে তুই জানিস না, স্নেহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়!'

রঘু মাথা নাড়ে – 'কি জানি, বুঝতে পারছি না! কিন্তু যাই বল, ওনার সাথে এটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না।'

চিন্তিত মুখে অঙ্কিত এবার বলল – 'আমি অবশ্য ওনাকে দেখিনি, তবে একটা কথা ভাবছি। দ্যাখ, বই কেনা কোনও খারাপ ব্যাপার নয়। আর সত্যিই তো, বইগুলো থাকলে তোর অনেকটা সুবিধা হবে। আর কালিচকে তো ঠিক ঠাক একটা বইএর দোকানও নেই। ইচ্ছে হলেও তুই এখানের দোকানে দরকারি বইগুলো পাবি না। সেদিন যে বইগুলো আমি কিনলাম, সেই তো কলকাতাতেই যেতে হল। আমি আর নিখিল বাসে করে গিয়েছিলাম। সেদিন আবার কিসের যেন এক মিছিল বেরিয়ে ছিল, রাস্তায় কি জ্যাম! যেতে আসতেই আমাদের জান বেরিয়ে গেছে। চান্স যখন পেয়েছিস, এসি গাড়িতে চড়ে আরামসে চলে যা। বইগুলো কিনে আন। তেমন মনে হলে পরে না হয় বইএর দাম দিয়ে দিস। কিন্তু ...' চোখ বড় বড় করে রঘুকে সাবধান করে অঙ্কিত, 'মনে রাখিস, আনন্দীর থেকে সাবধান থাকবি! বড়লোক বাপের বিগ্‌ড়ে যাওয়া মেয়ে, কোনো বিশ্বাস নেই ওকে!'

অঙ্কিতের সতর্কবাণী শুনে রঘু আশ্বাস দেয় – 'ওটা নিয়ে কিছু ভাবিস না তুই। আনন্দীকে আমি সামলে চলব । নে, এবার কোশ্চেন পেপারটা বার কর। অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল!'

(চলবে)

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলন ঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১১

বিশ্রী একটা শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে আজ। আকাশটাও যেন মেঘে মেঘে ভর্তি হয়ে আছে। শীতের সকালে এমন আবহাওয়া দেখলেই শিঞ্জিনীর মন বড় খারাপ হয়ে যায়। শীত মানেই উজ্জ্বল রোদের এক ঝাঁক তার কাছে। গায়ে জড়ানো আলো, হাল্কা নীল আকাশ, ঝকঝকে চেহারা নিয়ে শিঞ্জিনীর বড় বন্ধু হয়ে ওঠে শীতকাল, প্রতিবারেই। কিন্তু আজকের দিনটা যেন একদম অন্যরকম, যেন আকাশের কান্না পাচ্ছে খুব।

আজ যথাসম্ভব সুন্দর করে সাজবার চেষ্টা করছে শিঞ্জিনী। আসলে, সাজগোজে তার একদমই আগ্রহ নেই। আর মানুষের যাতে আগ্রহ কম থাকে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেই কাজটা ভালভাবে করে উঠতে পারে না। শিঞ্জিনী দেখেছে তার কত বন্ধুরা কি সুন্দর সাজতে পারে! কিন্তু সে ও'বিষয়ে বড়ই অপটু। কেবল চোখে কাজল পরতে বড় ভালো লাগে তার। সুনন্দা মজা করে বলে, "শিঞ্জিনী তুই তোর চোখ দুটোকে ছাড়া দেহের আর কোনও অঙ্গকেই ভালবাসিস না"। সুনন্দা ভারী সুন্দর করে সাজতে পারে। এই সাজ নিয়েই সেদিন সুনন্দাদের ফ্ল্যাটে কি কাণ্ডই না হল!

পার্ট-টু পরীক্ষা দেওয়ার পরে একদিন সুনন্দাই প্রস্তাব দিল শিঞ্জিনী, পারমিতা, চন্দ্রাণীদের। আসলে, এই ওদের অনেকদিনের ইচ্ছা যে একদিন তারা মদ্যপান করবে। মদ্যপান নিয়ে অদম্য আগ্রহ তাদের। একদিন তারা দেখতে চায়, মদ খেলে কি হয়! শিঞ্জিনীর উৎসাহটাই সবচেয়ে বেশী। দেখতে-শুনতে, কথা-বার্তায় শান্ত শিষ্ট হলেও, তার ভিতরে যে বাউন্ডুল মনটা আছে, তাকে খুব প্রশ্রয় দেয় সে। আসলে, তার মনে হয় যে চরিত্র জিনিসটা অত ঠুনকো নয়, অত সহজে চরিত্রের ভিত নড়বড়ে হয় না। বরং মনের কথাই সব সময়ে শোনা উচিৎ মানুষের।

যাই হোক, সুনন্দার প্রস্তাবটা অতিশয় লোভনীয়। তার বাবা, মা এক আত্মীয়ের বিয়েতে জামসেদপুর যাচ্ছেন দু দিনের জন্য। সুনন্দা যাচ্ছেনা, কাজেই তাদের ফ্ল্যাটে কাজটা সেরে ফেলা যেতেই পারে। গত একবছর ধরে খালি পরিকল্পনাই করে আসছে তারা, সুযোগ পাচ্ছেনা। অতএব সুযোগটা লুফে নিল তারা। শিঞ্জিনীর অবশ্য খুবই ভয় করছিল যে বিমল বেঁকে না বসেন মেয়েকে সারারাত বন্ধুর বাড়িতে থাকতে দিতে। কিন্তু শিঞ্জিনীর বান্ধবীরাই একদিন তার বাড়ি গিয়ে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে এক গল্প ফেঁদে এমনভাবে বিমলকে রাজি করিয়ে ফেললো যে শিঞ্জিনী তো অবাক। তারপর নির্দিষ্ট দিনে সে কি উত্তেজনা – লুকিয়ে লুকিয়ে মদ কিনে আনা, ঝাল-ঝাল মাংস রাঁধা! গণ্ডগোলটা হল মাঝরাতে। শিঞ্জিনী বড়বড়িয়ে বমি করে দিল সুনন্দার গায়ে। ব্যস, সুনন্দার সে কি কান্না। তার বক্তব্য যে সে এত সুন্দর করে সেজে আছে আর শিঞ্জিনী কিনা তার গায়ে বমি করে দিয়েছে! নেশার ঘোরে সে একই কথা বলে যেতে লাগলো আর কাঁদতে লাগলো। নেশার আবহে হাসি-কান্না সবই বড় সংক্রামক। অতএব, প্রথমে পারমিতা, তারপর চন্দ্রাণী, শেষে শিঞ্জিনীও কান্না জুড়ে দিল। সে কান্না চলেছিল ভোররাত অবধি। তারপর ঘুম থেকে উঠে কোমর বেঁধে সবাই মিলে ফ্ল্যাট পরিষ্কার করাও ছিল এক মহাকান্ড!

আজ শিঞ্জিনীর জীবনে বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। তমালকে আজ ডেকেছে সে। খুব বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আসলে। প্রায় দু বছর তাদের সম্পর্কের বয়স। এই দু বছরে তমাল শিঞ্জিনীর জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করতে পেরেছে। শিঞ্জিনী তমালকে খুব ভালবাসে। কত সুন্দর সুন্দর কবিতা এখন উঠে আসে তার হাতে। আসলে, জীবনের এই পর্যায়ে পৌঁছে শিঞ্জিনীর উপলব্ধি হয়েছে যে ভালবাসা অসীম, তার কোনও মাপকাঠি নেই। এমন নয় যে তমালের সঙ্গে এই বিষয়ে খুব একটা মতৈক্য আছে তার। তমাল দৈহিকভাবে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে বারকয়েক, কিছুই নয়, একটু আলিঙ্গন বা চুমু। শিঞ্জিনী দেখেছে তমাল মনে করে দেহ ও প্রেম অতীব সম্পৃক্ত, কিন্তু তার ধারণাটা অন্যরকম। তার কাছে ভালোবাসা

এক তীব্র অনুভূতি যা শুধু নির্দিষ্ট মানবদেহের স্পর্শেই প্রকাশিত হতে পারেনা, এই প্রকৃতি এই মানবসমাজ, এই বিশ্বের আনাচে কানাচে তা প্রকাশিত হতে পারে, বোধকে যদি সেই স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। ভালোবাসা আসলে ঈশ্বর দর্শনের আর এক নাম। দেহকে অস্বীকার করেনা সে, কিন্তু দৈহিক সংস্পর্শ তার কাছে ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রকাশের এক মাধ্যম মাত্র। দেহ অত গুরুত্বপূর্ণ নয় তার কাছে, তার কাছে আসল হল মন।

শিঞ্জিনী নিজের মনটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা নিজেই সবসময়। তমালকে সত্যিই ভালোবাসে সে, চিন্তাগত পার্থক্য সত্ত্বেও ভালোবাসে। তমালের সান্নিধ্য সে উপভোগ করে, নানা বিষয়ে কথা বলতে পারে তমাল, একটা চিন্তাশীল মন আছে তার। অথচ কখনও কখনও শিঞ্জিনীর স্বপ্নে আসে সেই নীল ছেলেটি। আশ্চর্যের ব্যাপার, গত দুবছরে নীলের সঙ্গে দেখাই হয়নি তার, নীলের সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানে সে! অথচ অদ্ভুত সব স্বপ্নে নীল ফেরে তার কাছে। একদিন দেখল, গাছে ঢাকা অন্ধকার এক রাতে হাল্কা জ্যোৎস্নার আলোয় নীল তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আরেকদিন দেখল সে আর নীল একটি পাহাড়ি পথে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যেটা সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, নীল কেবল স্বপ্নেই আসে তার কখনও – কদাচিৎ, সারাদিনে শিঞ্জিনীর কিন্তু মনেও পড়েনা ছেলেটাকে।

শিঞ্জিনী এখন এম.এ. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কিছুদিন বাদেই পরীক্ষা তার। কিন্তু এক সমস্যায় পড়েছে সে। সমস্যাটা অনিন্দ্য কে নিয়ে। অনিন্দ্যর স্বপ্ন অবশেষে সফল হয়েছে। ইউ.এস.এ.-তে একটি ভালো চাকরি হয়েছে তার। মায়াকাকিমাদের ইচ্ছা, অনিন্দ্য বিদেশে যাওয়ার আগেই তার একটি পাত্রী ঠিক করার। সেজন্য কাগজে দিয়েছেনও তারা। বিমলদের মনে অনিন্দ্যর সঙ্গে শিঞ্জিনীকে জুড়ে যে আগ্রহ ছিল, তা এখন অনেকটাই স্তিমিত। তারা তমালের বিষয়টি ধরতে পেরেছেন যদিও মেয়ের সঙ্গে এ নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা হয়নি কখনও।

একদিন হঠাৎ অনিন্দ্য এসে হাজির হল তাদের বাড়িতে। শিঞ্জিনীকে স্পষ্টই জানালো যে যদিও বাবা, মা কাগজে তার পাত্রী খুঁজছেন কিন্তু সে শিঞ্জিনী কেই বিয়ে করতে চায়। সে জানে শিঞ্জিনীর এম.এ. শেষ হতে আরও একবছর। অপেক্ষা করতে সে রাজী, শুধু শিঞ্জিনীর মতটা পেলে নিশ্চিন্তে বিদেশে যেতে পারে। অনিন্দ্যর মুখের উপর না বলতে খারাপ লেগেছিল সেদিন শিঞ্জিনীর। সে বলেছিল "ভেবে দেখার সময় দাও, আমি এখনই কিছু বলতে পারছিনা। স্বভাবভদ্র অনিন্দ্য এক কথায় মেনে নিয়েছিল সে কথা, শুধু অনুরোধ করেছিল সিদ্ধান্তটা বেশী ঝুলিয়ে না রাখতে।

আজ তাই নন্দনে তমালের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে শিঞ্জিনী, তমালের ভালো লাগে বলেই এখন একটু সাজবার চেষ্টা করে সে। তমালের মাস্টার্স হয়ে গেছে, সে এখন বাঁশবেড়িয়া ফিরে গেছে। নানা প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষায় বসবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন নিয়মিত আর দেখা হতে পারে না তাদের, ফোনেই কথা হয় রোজ, মাঝে মাঝে তমাল আসে অবশ্য কলকাতায়।

শিঞ্জিনী অনিন্দ্যর কথাটা পাড়তেই কেমন চুপসে যায় তমাল। বলে, "শিঞ্জিনী, আমি তো প্রতিষ্ঠিত হতে পারি নি এখনও তেমন, তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারোনা ?"

"আমি তোমার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারি তমাল। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার একদিন আসা উচিৎ আমাদের বাড়ি, আমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারি আমরা। আমাদের সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট করা উচিৎ এবার সবার কাছে"।

"না, শিঞ্জিনী, দ্যাখো, আমি সাধারণ অবস্থার ঘরের ছেলে। তোমাদের অবস্থা অনেক ভালো আমাদের চেয়ে। আগে আমাকে ভালো একটা চাকরি করে তোমার যোগ্য হয়ে উঠতে দাও, তারপর গিয়ে তোমার বাবার কাছে তোমাকে চাইব ?"

"তমাল!" আর্তনাদের ভঙ্গিতে ডেকে ওঠে শিঞ্জিনী, "আমার কাছে তোমার যোগ্যতা কি তোমার চাকরির উপর নির্ভর করে? আমি কি তোমাকে তোমার চাকরির ভরসায় ভালবেসেছি? আর বাবার কাছে গিয়ে আমায় চাইবে মানে কি? আমি তো নিজেকে নিজেই তোমাকে দিয়েছি, বাবার অনুমতি নেওয়ার কথা ভেবেছি কি তখন!"

"তুমি বিষয়টা বুঝছনা শিঞ্জিনী। ভালোবাসা এক জিনিস আর বিয়ে করবার জন্য যোগ্য হয়ে ওঠা আরেক। আমি এখন কোন যোগ্যতায় তোমার আমার সম্পর্কের কথা সবাইকে বলব ? আগে আমাকে দাঁড়াতে দাও প্লিজ, তোমাকে বিয়ে করবার যোগ্য হয়ে উঠতে দাও"।

হঠাৎ কেমন যেন স্থির হয়ে যায় শিঞ্জিনী। ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ায় সে ঘাস ছেড়ে। শান্ত, নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, "তমাল, প্রেমিকের যোগ্যতা তার ভালবাসার শক্তিতে, চাকরির জোরে নয়। তুমি যদি আজ আমার যোগ্য না হও, তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চাকরি করলেও কোনদিন আমার যোগ্য হয়ে উঠতে পারবেনা। ভালোবাসা অন্য কিছু চায় তমাল, বিশ্বাস করো। না তমাল, আমি তোমার কাছে ঘোষণা করছি, তুমি আমার অযোগ্য, চিরকালের অযোগ্য। তুমি আর কোনওদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করোনা, কোনোদিনও না। জেনো, করলে তা আমার ভালবাসাকে ধর্ষণের সামিল হবে"।

কথাগুলো বলেই পা বাড়ায় শিঞ্জিনী। পিছন থেকে তমাল তাকে ডাকতে থাকে। সে আর ফিরেও তাকায় না। দৃঢ় পদক্ষেপে রাস্তাটা পেরিয়ে যায়।

সেদিন সন্ধেবেলায় শিঞ্জিনী বিমলকে জানায় অনিন্দ্যর প্রস্তাবের কথা, জানায় যে সে অনিন্দ্যকে বিয়ে করতে রাজী। স্থির দৃষ্টিতে তাকে কিছুক্ষণ জরিপ করেন বিমল। তারপর প্রশ্ন করেন, "ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিচ্ছ তো? এটা পালানো নয় তো? আর তোমার পি.এইচ.ডি. ?"

"না পি.এইচ.ডি আর করব না বাবা, তুমি অনিন্দ্যকে জানিয়ে দাও", বিমলের অন্তদৃষ্টির সামনে থেকে দ্রুত সরে আসে শিঞ্জিনী।

সে রাত্রে খুব কাঁদে শিঞ্জিনী। মাথার বালিশ দুহাতে আঁকড়ে বুক ফাটিয়ে কাঁদে সে। হ্যাঁ – সে পালাতে চায়, এই শহর ছেড়ে পালাতে চায়। এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে সে। এ কলকাতা শহর তার ভালবাসাকে আঘাত করেছে, এ শহর তার অনুপযুক্ত। অন্য কোথাও চলে যাওয়া দরকার তার এই মুহূর্তে – অন্য কোনও পৃথিবীতে। সে জানে অনিন্দ্যর সঙ্গে তার মিল নেই মনের ধরণে। নাই থাক, অনিন্দ্য ভদ্র, সভ্য, ভালো পাত্র। তাকে বিয়ে করে এমন জায়গায় চলে যেতে চায় শিঞ্জিনী যেখানে মন নিয়ে বিড়ম্বনায় ফেলবে না কেউ। তার আর বাঁচতে ইচ্ছা করেনা এই শহরে, এই শহরে শ্বাস নেওয়া দুর্বিষহ তার পক্ষে। ছেড়ে যাবে সে, প্রিয় শহর ছেড়ে চলে যাবে শিঞ্জিনী। কলকাতা শহর ঘুমতে থাকে, জানতেও পারেনা তার প্রিয় এক নাগরিক কত কষ্টে তাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছে! পালাতে চাইছে নিজের থেকে।

****

চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। মাঝে-মাঝে মনে হয় পৃথিবী যেন সেই আদিম বরফের যুগে ফিরে গেছে এখানে। রাস্তাঘাটে, গাছের পাতায় বাড়ির ছাদে, বারান্দার কাঠের রেলিং জুড়ে শুধু বরফ আর বরফ। সময় যেন জমে স্থির হয়ে আছে এখানে। প্রথম প্রথম অদ্ভুত লাগত এই পরিবেশ। মনে হত কি আশ্চর্য এক রূপকথায় মোড়া রয়েছে গোটা অঞ্চল, আবার কখনও মনে হত এইভাবেই এই বরফের স্তূপে একদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে পৃথিবীর প্রাণ। আর এইসবের মাঝে শিঞ্জিনীকে অবাক করত এখানকার মানুষদের কর্ম্যোদম এবং জীবনের প্রতি উৎসাহ। এত বরফ, রাস্তায় চলাই দায়, এখানকার মূল যানবাহন বলতে নিজের নিজের গাড়ি, সে গাড়ির ছাদও সাদা চাদরে মোড়া, তবু মানুষ বাইরে বেরোচ্ছে সব প্রয়োজনে, অফিস যাচ্ছে, স্কুল কলেজ যাচ্ছে। আসলে মানুষের, বিশেষত এই জাতটার, এত উন্নতির পিছনে এটাই বোধহয় আসল কারণ, কোনও প্রতিবন্ধকতাতেই থমকে না যাওয়া। একটা গোটা জাত যে কি দুরন্ত উৎসাহে হুড়মুড়িয়ে এগোতে পারে, তা অনিন্দ্যকে বিয়ে করে আমেরিকায় না এলে বুঝতে পারতনা শিঞ্জিনী। বছর দুই হয়ে গেল 'কানেটিকাটে' এ এসেছে তারা। নিউ ইয়র্ক শহর থেকে দুঘণ্টা দূরত্বের এই শহরটাকে ভারতের অধিকাংশ মানুষ অবশ্য বানান অনুযায়ী 'কানেক্টিকাট' উচ্চারণ করে। সে অবশ্য লন্ডনের পিকাডিলি সার্কাসকেও এই নামে ডাকে ভারতীয়রা যদিও সাহেবরা পিকলি সার্কাস বলে

থাকে। আসলে, সব দেশেই কিছু কিছু জায়গা থাকে যেখানকার নাম বিদেশীরা তাদের সুবিধা মতো উচ্চারণ করে, স্থানীয় উচ্চারণ বা প্রথা অনুযায়ী নয়। ভারতেও যেমন সাহেবরা বর্ধমানকে বারডোয়ান বলত অথবা চুঁচুড়াকে চিন্সুরা। অবশ্য অতিরিক্ত সাহেব প্রীতিতে অনেক বাঙালিও চিন্সুরা বলে থাকে। আসলে, ভারতীয়দের, বিশেষতঃ বাঙালিদের, একটা ধারণা আছে সাহেবরা যা উচ্চারণ করেন, সেটাই ঠিক, তা যতই বিকৃত হোক। এমনকি বাপঠাকুরদার বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় জাতীয় পদবিগুলোকে আমরা অনায়াসে ব্যানার্জি বা মুখার্জী বলে আত্মস্থ করে নিয়েছি, রবীন্দ্রনাথকে টেগোর হিসাবে। কিছু মানুষের আবার ধারণা আছে রবীন্দ্রনাথকে বাঙলায় ঠাকুর এবং ইংরাজিতে টেগোর বলতে হয়।

দুদিন ধরে অফিসেই আছে অনিন্দ্য। কি এক প্রোজেক্ট সময়ে শেষ করতে হবে তাই টানা অফিসেই রয়ে গেছে অনিন্দ্য এবং অনিন্দ্যর মতো মানুষগুলো, কোম্পানী তাদের মোটা টাকা দিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম শিঞ্জিনী অবাক হয়ে যেত, মাস মাইনের বাইরেও কতরকম অ্যালাউন্স পায় অনিন্দ্যরা! পর্দা কেনবার অ্যালাউন্স, বাজার করবার জন্য চাকর রাখবার অ্যালাউন্স, আরও নানা রকমের। একঝলক দেখলে মনে হবে আহা! কর্মচারীটির দিকে কোম্পানীর নজরের খামতি নেই। কিন্তু একটু ভিতরে ঢুকলেই আসল উদ্দেশ্যটা পরিস্কার হয়ে যায়। কোম্পানীর বক্তব্য খুব সহজ ও সোজা, বাপু হে, তোমার কোনও জাগতিক প্রয়োজন আমরা অপূর্ণ রাখবনা, যা চাইবে পাবে, শুধু তোমার জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ্য সম্পদটি আমাদের হাতে তুলে দাও – সময়। সময় কিনে নেয় এই কোম্পানীগুলো আর টাকার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কৃতি মানুষগুলো নিজেদের অজান্তেই ধীরে ধীরে ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যায়। যেভাবে ড্রাগ ব্যবসায়ীরা মানুষকে ড্রাগের নেশা ধরিয়ে দেয়, যেভাবে ধর্মের আফিম গিলিয়ে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে, ঠিক সেই কায়দাতেই কোম্পানীগুলো মানুষকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে তারা ছাড়া কোম্পানী অচল, তারা কাজ করছে টাকার জন্য নয়, যেন করছে কাজকে ভালোবেসে। এও একধরণের মগজ ধোলাই, সত্যজিতের হীরকরাজার দেশের মতোই। প্রথম প্রথম এই একলা থাকাটা শিঞ্জিনীর অসহ্য লাগত, কান্না পেত। নিষ্ঠুর মনে হত অনিন্দ্যকে। মনে হতো একছুটে পালিয়ে যাবে কলকাতা শহরে সে। আস্তে-আস্তে শিঞ্জিনী বুঝে গেল এটাই নিয়তি, মিডাস হওয়ার নেশার এটাই শেষ কথা। শুধু অনিন্দ্য তো নয়, দেশ থেকে আসা হাজার হাজার ছেলে দিনরাত এই করে চলেছে। বিনোদন বলতে উইক-এন্ডে কারও বাড়িতে জমায়েত হয়ে দেদার খানাপিনা অথবা গাড়ি হাঁকিয়ে অন্য কোনও শহরে অন্য বৈভবের প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া। প্রথম প্রথম ভালোই লাগে এসব। তারপর ধীরে ধীরে বিনোদনও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তখন বছরে একটা শনিবারের দুর্গাপুজো আর একটা বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, ব্যস! নতুনত্ব বলতে এইটুকু পড়ে থাকে।

শিঞ্জিনীর আজকাল কলকাতার জন্য ভীষণ মন কেমন করে। একদিন চরম অভিমানে ওই শহরকে পিছনে ছেড়ে এসেছিল সে, ভেবেছিলো কলকাতার মুখ না দেখে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু আজকাল কলকাতা তার যাবতীয় আকর্ষণ নিয়ে শিঞ্জিনীকে টানতে থাকে। কলেজ স্ট্রীট, কফিহাউস, পুরনো বই এর গন্ধের স্মৃতি মাতাল করে তাকে, কলকাতা ময়দানের ছড়ানো ছিটানো সবুজ, অ্যাকাডেমি, নন্দন যেন দুহাত বাড়িয়ে ডাকে শিঞ্জিনীকে। একদিন শিঞ্জিনী হেলায় ত্যাগ করেছিল তাদের, আর আজ ফিরে যাওয়ার শত ইচ্ছা থাকলেও যে ফিরে যাওয়া যাবে না, বসা যাবেনা ন্যাশনাল লাইব্রেরির নিউজ পেপারের সেকশনে, শিঞ্জিনী বোঝে সেটা। আর একজন খুব উঁকি মারে তার মনে, যখন তখন তার দুটো চোখ বেসামাল করতে থাকে শিঞ্জিনীকে, সে নীল। নীলের কথা শিঞ্জিনীর খুব মনে পড়ে। মনে হয় এই মানুষটাকে আরও একটু সময় দেওয়া উচিৎ ছিল। শিঞ্জিনীর মনের দিশা তমালও বোঝেনি, অনিন্দ্যও না। কিন্তু শিঞ্জিনীর বিশ্বাস নীল বুঝতে পারত। নীলের চোখে, নীলের কথায় সে' অমোঘ ইঙ্গিত পেয়েছিল সে। এখন মনে হয়, কত কথা তার বলবার ছিল নীলকে, তার মনের কথা, স্বপ্নের কথা, যেসব কথা আর কাউকে বলে উঠতে পারা যায়না, সেইসব কথা। সারাদিন বান্ধবহীন এই জীবনে যেন সে আক্ষেপ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। আচ্ছা নীলেরও কি তাকে বলবার কিছু ছিল ? তবে বলেনি কেন ? সংকোচ ? লজ্জা ? নাকি এ শিঞ্জিনীর মনের ভুল ? নীলের মতো দমকা হাওয়া তার কথা দাঁড়িয়ে ভাবেইনি কখনও ?

শিঞ্জিনীর এখন তিনমাস চলছে। মাস দেড়েক আগে যখন কথাটা সে বুঝতে পারল, খুব আনন্দ হয়েছিলো। অনিন্দ্য

তখন অফিসে। পাগলের মতো সে ফোন করেছিল অনিন্দ্যকে। অনিন্দ্য ব্যস্ত ছিল, প্রতিবারই 'একটু পরে' বলে ফোন কেটে দিচ্ছিল সে। তিনবারের বার শিঞ্জিনী ফোন করতে একটু বিরক্তিই প্রকাশ করেছিল। সেদিন শিঞ্জিনীর খুব অসহায় মনে হয়েছিলো নিজেকে। মনে হয়েছিল এ দেশে এখন কেউই তার নেই যে শিঞ্জিনীর সবকিছু ভাগ করতে পারে- দুঃখও, আনন্দও। ফোন করে কলকাতায় মাকে খবরটা দিয়েছিল খালি। অনিন্দ্য অবশ্য রাতে ফিরে খুব খুশি হয়েছিল। শিঞ্জিনীকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিয়ে বলেছিল 'thank you very much'।

এ দেশে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের খুব যত্ন করা হয়। কত নিয়ম কানুন, কত পরীক্ষা নিরীক্ষা সদাসতর্ক থাকে এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে পৃথিবীর আগামীদিনের নাগরিকটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার পথে কোনো বাধা না থাকে। অনেকরকম বাধ্যতামূলক ব্যায়াম করতে হয় শিঞ্জিনীকে, ক্লাসে গিয়ে, বাড়িতেও। তারমধ্যে শিঞ্জিনীর সবচেয়ে পছন্দ বিকেলে হাঁটতে যাওয়াটা। দারুণ লাগে এখানকার পথে হাঁটতে তার। রোজ বিকেলে শিঞ্জিনী বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় শহরের পূর্বপ্রান্তের দিকে। সেখানে এক গুজরাটি ভদ্রলোক, নাম লালজি দেশাই, একটি বড় বইয়ের দোকান করেছেন। লালজি এখানে খুব জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। ভারী অমায়িক, ভারী উপকারী। তার দোকানে ভারতের নানা ভাষার বইয়ের আলাদা আলাদা বিভাগ আছে। বাংলা বইয়ের বিভাগটি বেশ বড়সড় এবং সমৃদ্ধ। দেশে নতুন যা বই বেরোয় তা এখানে রাখার চেষ্টা করেন লালজি। নতুন বাংলা বইয়ের এক দুর্নিবার আকর্ষণে শিঞ্জিনী নিয়মিত হাজিরা দেয় এখানে। আজই যেমন পেয়ে গেল আনন্দ থেকে প্রকাশিত জয় গোস্বামীর নতুন একটা কবিতার বই। একমনে উল্টে পাল্টে দেখছে সে, কানে এল, "নমস্কার, আচ্ছা এখানে মেঘনাদ বধ কাব্যের উপর কোনও আলোচনার বই পাওয়া যাবে কি?" চোখ তুলতেই অবাক হয়ে গেল শিঞ্জিনী। তার সামনে এক অত্যন্ত সুপুরুষ বিদেশী দাঁড়িয়ে এবং স্পষ্ট বাংলায় করা প্রশ্নটি এসেছে সেই বিদেশীর কাছ থেকেই। বোঝাই যাছে, সাহেব তাকে এই দোকানের কর্মচারিণী অথবা মালকিন ভেবেছে। শিঞ্জিনী বলল "আমি ঠিক বলতে পারবোনা, আসলে আমিও এখানে বই দেখতে এসেছি"।

"ও হো! মাপ করবেন, আমি নিজেই খুঁজে নিচ্ছি। বাই দ্যা ওয়ে, আপনার হাতে ওটা কি বই?"

শিঞ্জিনী কোনও কথা না বলে নীরবে বইটা এগিয়ে দিতে একগাল হেসে জবাব আসে, "আমি এখনও আধুনিক বাংলা কবিতা বোঝাটা ঠিক রপ্ত করতে পারিনি"। একটু থেমে যুবক আবার বলে, "আমার নাম কেভিন, কেভিন সাদারটন"। সমবয়স্ক যুবকটির দিকে হাতজোড় করে নমস্কার করে শিঞ্জিনী বলে "আমি শিঞ্জিনী"।

"আমি জানি প্রত্যেক ভারতীয়ের নামের একটা করে সুন্দর মানে থাকে। শিঞ্জিনী মানে কী"?

"শিঞ্জিনী মানে নূপুর। নূপুর মানে ..."

"আমি নূপুর মানে জানি।" শিঞ্জিনীকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে কেভিন, নূপুর হল ভারতীয় মেয়েদের পায়ের একটা অর্নামেন্ট। রাইট?" একগাল হেসে বলে ওঠে কেভিন। তারপর খুব বিনীত ভাবে জানায় "বাইরে একটা চমৎকার কফিশপ আছে। চলুন না এক কাপ কফি খেতে খেতে গল্প করা যাক"।

শিঞ্জিনী আলতো মাথা নেড়ে হেসে বলে, "বেশ চলুন।"

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ৫

(৬)

বাপ্পা আজ আহেলীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাবলো। আহেলী এক কথায় রাজী। তারপর বললো – "আচ্ছা কাল তো রবিবার, সাম্যর স্কুল ছুটি – সাম্যও চলুক না আমাদের সঙ্গে? মা খুব খুশী হবেন।" তাই ঠিক হলো। গৌরীকে সব বুঝিয়ে দিয়ে তিনজনে বেরিয়ে পড়লো।

কলকাতার এই অভিজাত হাসপাতালটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সাজানো, যেমন বাইরেটা তেমন ভেতরটা। হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ নেই, চত্বরে ফুলের শোভা। শুচি কোনভাবেই এই নামী দামী হাসপাতালে আসতেন না, যদি না বাপ্পা ডঃ দত্তর সঙ্গে যোগসাজস করে এটা ঘটাতো। একটু ছলচাতুরী করতে হয়েছে কারণ শুচি এখন কারুর কাছ থেকেই আর কিছু নিতে চান না। বলেন – "ঋণের বোঝা ভারী করে আর কাজ নেই।" সুতরাং "চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন" এবং এখানে ডঃ দত্তর একটা "special quota with a free bed" আছে বলে নিয়ে আসা হয়েছে। মায়ের জন্যে এইটুকু করতে পেরে বাপ্পার সত্যি ভালো লেগেছে।

কিন্তু আজ বাপ্পা একটু মুষড়ে আছে – রীতির সম্বন্ধে মা'কে দেওয়ার মতো কোনো ভালো খবর নেই।

শুচি কিন্তু সেদিক দিয়েও গেলেন না। আহেলীর সঙ্গে কথা শুরু করলেন, সাম্যর হাতে একটা মুসাম্বী তুলে দিলেন। সাম্য উৎসাহের সঙ্গে স্কুলের গল্প শুরু করলো।

বেরোনোর মুখে বাপ্পা আস্তে করে বললো – "রীতির এইমাসে খুব কাজের চাপ, ও যে কবে আসতে পারবে ......"

শুচি হাসিমুখে বললেন – "ঠিক আছে, ব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ...... আবার এসো সাম্যবাবু!"

মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলো বাপ্পা। ব্যস্ত হওয়ার কারণটা যে কী তা বাপ্পা ডঃ দত্তর সঙ্গে গত সপ্তাহে কথা বলার পরেই বুঝেছে। শুচির চেহারা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ডঃ দত্ত বাপ্পার কাছে কিছুই লুকোননি।

সেই যে প্রায় বছরখানেক আগে বাপ্পা ওনার চেম্বারে ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলো, সেদিন থেকে এই গত কয়েকমাসে ডঃ দত্তর সঙ্গে বাপ্পার ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়ে গেছে। সেদিন বাপ্পা সাহস করে ডঃ দত্তকে জিগেস করতে পারেনি ওনার পেশেন্টের পরিচয়, রিসেপশনিস্টকে নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে চলে এসেছিলো। তারপর শুরু হয়েছিলো প্রতীক্ষা – ফোন আসে কি না !

প্রায় দশ-বারোদিন কেটে যাওয়ার পর, বাপ্পা যখন ধরেই নিয়েছে যে সে ভুল ভেবেছে ..... ফোন আসবে না, তখন একদিন বিকেলবেলা ফোন এলো। প্রায় পাঁচটা বাজে, বাপ্পা ফাইল-টাইল গুছিয়ে অফিস থেকে বেরোনোর জন্যে তৈরী হচ্ছিলো। এমন সময় cell phone টা বেজে উঠলো। অচেনা নাম্বার। তুলবে কি তুলবে না ভাবতে ভাবতে তুলেই ফেললো।

একটু ভাঙা ভাঙা কাঁপা গলায় প্রশ্ন ভেসে এলো – "Is this Satadru Banerjee?"

"Yes, who is this?" বাপ্পা ফোনটা কানে চেপে ফাইলদুটো ব্যাগে ঢোকাতে লাগলো।

একটুক্ষণের নীরবতা। তারপর উত্তর এলো – "আমি শুচি ..... শুচি ব্যানার্জ্জী ... এখন শুচি সেন। ডঃ দত্তর রিসেপশনিস্ট আমাকে ফোন নাম্বারটা দিয়েছিলো ... আশাকরি আমার ভুল হয়নি ?!"

থতমত বাপ্পার হাত থেকে ফাইল নীচে পড়ে গেলো।

সেটা কি বাপ্পার দ্বিতীয় জন্ম ছিলো? বাপ্পা কি "দ্বিজ"?

ঠাকুমা বাবার আড়ালে ফিসফিস করতেন কল্যাণীর বাড়ীর কাজের পিসির সঙ্গে – "সংসারটা ছারখারে গেলো ঐ লক্ষ্মীছাড়ীর জন্যে ... একমাত্র সন্তান আমাদের ... বিবাগীর মত থাকে ... মুখে কথা নেই ... আগে "মা" বলতে অজ্ঞান ছিলো ... এখন কল্যাণীর বাড়ী মাড়াতেই চায় না ... কথা বললে কানে নেয় না ... বাড়ীটা যেন ভূতের বাড়ী ... বংশধর বলতে ঐ বাপ্পা ....তার পৈতে পর্যন্ত দিলো না ... ব্রাহ্মণ বলে কথা ... পৈতে হলে তবে সে হল গিয়ে দ্বিজ ... ঐ আবাগীর পেটে জন্মে তাও হলো না ছেলেটার কপালে ... কতবার বলেছিলাম ঐ বদ্যিবাড়ীর মেয়েকে বিয়ে না করতে ... ছেলের প্রেম উথলে উঠলো !"

পৈতে হবার বয়সে সত্যিই পৈতে হয়নি বাপ্পার – হল গিয়ে একদম বিয়ের সময়, শুদ্ধি করে। বাবার যেন সবকিছু থেকেই মন উঠে গিয়েছিলো। নাকি বাবা লোকের থেকে মুখ লুকোতেন ? নিজের বা পরের, কারুর বাড়ীর কোনো অনুষ্ঠানেই তো যেতো না বাপ্পারা ! কল্যাণীর বাড়ীতেও সত্যি ওরা যেতো কালেভদ্রে, মা থাকতে বরং প্রতি সপ্তাহে যেতো একবার ... কিন্তু তারপর আর নয়। তাই বাঙালী বাড়ীর অনুষ্ঠানগুলো বোধহয় বাপ্পার ভেতরে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি সেইভাবে। বিয়ের সময়েও না। যে যা বলেছে যান্ত্রিকভাবে করে গেছে – মানে খোঁজার চেষ্টা করেনি।

বাপ্পার বিয়েটা ছিলো দীর্ঘ বাইশ বছর পরে এ'বাড়ীর প্রথম আনন্দানুষ্ঠান। সানাইয়ের আওয়াজ, ফুলের গন্ধ, আত্মীয়দের হাসি গল্প – সব মিলে যে মাদকতা তৈরী হয়েছিলো তাতে ডুবে যেতে যেতেও বাপ্পার অবচেতন মন কেবলই যেন কাকে খুঁজছিলো! বার বার মনে হয়েছিলো "কী যেন নেই"! বৌ-বরণের ভিড়ে আর বৌভাতের পংক্তিভোজনে কার যেন ফর্সা সুশ্রী একটা মুখ লুকিয়ে উঁকি মেরেও ধরা দিচ্ছিলো না। লুকোচুরি খেলতে খেলতে আর মাপা হাসি হাসতে হাসতে ক্লান্ত বাপ্পা ফুলশয্যার ঘরের দরজা বন্ধ করেই খাটে লুটিয়ে পড়লো। ফুলের গয়না পরা আহেলী ব্যস্ত হয়ে পাশে এসে বসলো। "কি হয়েছে?" প্রশ্নের উত্তরে বাপ্পা শুধু বললো – "মা"! তারপরেই বালিশে মুখ গুঁজে দিলো। আহেলী সযত্নে বাপ্পার মাথাটা কোলে নিয়ে চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো – "মা আসতে না পারলে কি হলো ... যেখানে আছেন সেখান থেকেই আমাদের আশীর্বাদ করছেন !"

"হয়তো তাই ..." বাপ্পা মনে মনে ভেবেছে। সাম্যর জন্মের পরও নিজেকে এই বলেই বুঝিয়েছে। তারপর কবে যেন একটু একটু করে মা'কে ভুলেই গেছে। ভেবেছে – "ভুলে গেলেই শান্তি ... মনে রাখলেই যন্ত্রণা!" আহেলী, সাম্য, চাকরির সাফল্য – এইসবও হয়তো কারণ, ভুলে যাওয়ার। আহেলীও তাই চায় – ভুলে যাক বাপ্পা। স্মৃতি নিয়ে বাঁচা যায়না। আর যে স্মৃতি বাপ্পাকে করে তোলে এলোমেলো, বিষণ্ন – তাকে বারবার মনে করে লাভ কী ?

শরতের সোনালী রোদ গায়ে মেখে নিতে নিতে, বাপ্পা তাই আর রোদে-ফাটা গ্রীষ্ম বা জল-ঝরানো বর্ষার দিনগুলোকে ভাবতে চায়নি। তারি সঙ্গে মুছে দিতে চেয়েছে বসন্তের দিনগুলোকেও – কারণ বাপ্পার কাছে ঐ বসন্তের দিনগুলো তখন শুধু আগামী দুর্যোগের প্রেক্ষাপট।

আহেলীর হাতের ছোঁওয়ায় গল্ফগ্রীণের ফ্ল্যাটটা যেন আস্তে আস্তে "বাড়ী" হয়ে উঠলো – বাপ্পার কাছেও, শীর্ষর কাছেও। এমনকি রীতিও ছুটিছাটায় এসে কয়েকদিন করে কাটিয়ে যেতে লাগলো, হাসিমুখে। দীর্ঘ যুদ্ধের পর ক্লান্ত সৈনিকের মতো শীর্ষ উপভোগ করেন সংসারের এই স্বাদ। বিছানায় বসে তিনি চা পেয়ে যান, আর ছুটতে হয়না দুধ আনতে বা বাজার করতে। বাপ্পা তার প্রিয় খাবারগুলো পেয়ে যায় টেবিলে, রান্নার মাসীর খাবারের থেকে যার স্বাদ আলাদা। রীতি

অপেক্ষায় থাকে আবার কবে "ladies day out" হবে আহেলীদির সাথে। আহেলী চাকরি করতে করতেও কিভাবে যে সব সামাল দিচ্ছে সেটা ওই জানে। কিন্তু দিচ্ছে খুবই দক্ষতার সঙ্গে। এটাও শীর্ষর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা।

তিনি জানতেন যে "বাইরে পা বাড়ানো মেয়ে কখনো সংসারের বৌ হতে পারে না, এরা সংসার ছারখার করে দ্যায়" ... তাঁর বোঝায় কি তবে একটা বড়ো ভুল ছিলো ! বুঝতে কি তিনি সত্যিই কোনদিন চেষ্টা করেছিলেন, নাকি শোনা কথাকেই অব্যর্থ সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন? কারণ সেটাই ছিলো সবচেয়ে সোজা কাজ – অভ্যাসের মতো সব মেনে নেওয়া। নতুন কিছু করতে যে শক্তি, সাহস আর উদ্যম লাগে সেটা বোধহয় তাঁর কোনদিন ছিলই না – একমাত্র সন্তান, আদর এবং সুরক্ষার বেড়াজালে নিরাপদ ভাবে বড়ো হয়েছিলেন তিনি। সেটাকেই জীবন বলে জানতেন।

এই যুগের ছেলেমেয়েরা অন্যরকম। এরা জীবন খুঁজে নেয় নিজের মতো করে – কোনো ছাঁচে নিজেদের আটকে ফেলে না।

বাপ্পা আর আহেলীর তো বোঝাপড়ায় কোনো চোট লাগেনি আহেলী চাকরি করছে বলে, এমনকি সাম্যর জন্মের পরেও! ছুটি নিয়ে, নিজের মা'কে বাড়ীতে এনে, গৌরীকে রেখে, ঠিক তো দশভুজার মতো সব সামলে নিলো আহেলী ! সবাইকে একটু adjust করতে হলো এই যা – এমন কিছু অসুবিধা তো মনে হলো না।

ওরা এখন আর second baby চায় না, এবং সেটা ওদের joint decision – বাপ্পার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

সাম্যর জ্বরজারি হলে আহেলী ছুটি নেয়, বাপ্পাও কখনো কখনো ছুটি নেয়।

একবার শীর্ষও ছুটি নিয়েছিলেন দু'দিন।

সবকিছুই হয়ে যাচ্ছে মসৃণ ভাবে – হয়তো অতিরিক্ত রোজগারটাও সংসারের চাকাকে তৈলাক্ত রেখে মসৃণ ভাবে চলতে সাহায্য করছে। আহেলী মাঝে মাঝে বাইরে থেকে খাবার কিনে আনে, রীতিকে নিয়ে shopping spree-তে যায়। সাম্য জন্মানোর আগেই দুজনে প্ল্যান করে গাড়ীটা কিনে ফেললো। মিনিবাস আর ট্যাক্সি ছেড়ে শীর্ষও আরাম পেলেন বইকি!

সেই আরামের স্বাদ নিতে নিতে মনে পড়ে যায় টুকরো টুকরো স্মৃতি।

– "বলে দিয়েছি তো চাকরি করার দরকার নেই" ...

– "কেন ?" ...

– "তোমার সব কেনর উত্তর দিতে পারবো না।"

– "এটা কি তোমার কথা, না তোমার মায়ের ?"...

– "তাতে তোমার প্রয়োজন ? ... আমি যা বলে দিয়েছি তা final ..."

– "আমাদের সংসারের সব final decision কি তাহলে তোমার মা-ই নেবেন?"

– "মা গুরুজন – সেটা ভুলে যেও না ..."

– "গুরুজনের দায়িত্ব বুঝি শুধু বৌকে দাবিয়ে রাখার ? ... আর কোনো গুরুদায়িত্ব তো পালন করতে দেখি না তোমার মা'কে ? বাপ্পা হওয়ার আগে পরে সব তো করলো আমার মা, আর তারপর আমি। উনি নাকি ছোট বাচ্চার ঝক্কি নিতে পারেন না ... একরাতও তো এসে থাকেননি! বাপ্পার অন্নপ্রাশনের পর নাতি চিনলেন!"

– "আমরা তো বরাবর প্রিকশান নিয়েছি ... কি করে হলো এটা ... ডাক্তার বললেন ২ মাস ... আমি নাহয় পিলটা বন্ধ করেছিলাম রিএ্যাকশনের জন্যে কিন্তু তুমি তো বলেছিলে তুমি precaution নিয়েছো, তাহলে ... কিছু বলছো না যে ?"

– "কি বলবো ?"

– "টাকার এতো টানাটানি ... বাপ্পাকে ভালো স্কুলে দেওয়া দরকার ..... তার মধ্যে আবার .... ?!"

– "ইনক্রিমেন্ট হবে আমাদের শীগগিরই ... কিসের এতো চিন্তা তোমার ? ... ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে ? ..."

– "চুপ করো ... একদম চুপ ! তোমার মায়ের কাছে শোনা বিষগুলো আমার কানের কাছে ঢেলো না !"

– "ঠিক আছে, আমার কথাই বলছি – টাকার চিন্তা তোমায় করতে হবে না ।"

– "শোনো, আমি একটা চাকরি নিচ্ছি – baby হওয়ার পরেই ।"

– "আবার ভূত চেপেছে মাথায় ? ... কতোবার বলবো যে মায়ের মত নেই! এই বাড়ীতে আমার বৌ হয়ে থাকতে গেলে তোমার স্বেচ্ছাচার চলবে না ।"

– "তা তো বটেই ... চলবে খালি তোমার মায়ের স্বেচ্ছাচার! তাহলে তোমার মা-কে এসে বলো সংসার সামলাতে, ওনার plan-এই যখন হচ্ছে সব ! ... তবে জেনে রাখো যে চাকরি আমি শুরু করছি ১ বছরের মধ্যেই, তোমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক!"

– "কার বুদ্ধি এটা? সুশোভনের নাকি তোমার দাদার আরেক বন্ধুর ? ... বন্ধুর বোনের জন্যে সবার এত চিন্তা!"

– " কি বললে ? ... এতো নীচে নেমেছো ?! নাকি এটাও তোমার মায়ের শেখানো কথা ?"

– "তুমি যা খুশী করো গে যাও, বাচ্চাদের দূরে রাখো .... ওদের গায়ে যেন আঁচ না লাগে ... তোমার ভাবনায় যদি ওরা বড়ো হয় তাহলে আর মানুষ হবে না! ওরা মানুষ হবে ব্যানার্জ্জী বাড়ীর শিক্ষায় আর তত্ত্বাবধানে !"

– "এই তোমার শেষ কথা তো ?"

– "হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা !"

– "আমি কাল মায়ের কাছে যাচ্ছি । Baby হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবো ।"

– "সে কী? এতো তাড়াতাড়ি? ... এখনো তো প্রায় মাস তিনেক বাকী !"

– "দাদা এসেছে অফিসের কাজে, একসপ্তাহের জন্যে । আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না । মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো, মা বললেন ওখানে গিয়ে থাকতে – একটু বিশ্রাম হবে, দাদার সঙ্গে দেখাও হবে । বাপ্পার স্কুলে আমি কথা বলে নিয়েছি, নীচু ক্লাস – অসুবিধা হবে না । টিচার বলেছেন বইগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে, বাড়ীতে পরপর পড়িয়ে গেলেই হবে – বাবা পড়াবেন বাপ্পাকে ।"

– "কাল যাবে ... কখন ... মা'কে ..."

– "তোমার মা তো পাঁচমাসের সাধ দিয়ে দিয়েছেন, এখন আর কিছু করণীয় নেই । আমার মা ন'মাসের সাধ দেবেন আমাদের বাড়ীতে – তোমার মা'কেও ডাকবেন । কাল শনিবার, দাদা সকালে এসে আমাকে আর বাপ্পাকে নিয়ে যাবে – তোমার যাওয়ার দরকার নেই ।"

কোনো ঝড়ের পূর্বাভাস কি ছিলো সেই অত্যন্ত ঠাণ্ডা কথোপকথনে ? ঠিক পরিস্কার না বুঝলেও একটু যেন অস্বস্তি লেগেছিলো শীর্ষর, কিন্তু বলার মতো আর কিছু কথা খুঁজে পাননি। নিঃশব্দে দেখলেন বড়ো স্যুটকেসটার সঙ্গে একটা ছোটো স্যুটকেসও গোছানো হলো। রোজের মতো খাওয়া-দাওয়া করে শোওয়া হলো। যদিও তাঁর ভালো ঘুম হলো না সেই রাত্রে। তার পরেও কি ভালো ঘুম হলো, পরের রাতগুলোয় ? ...

ন'মাসের সাধ হলো শুচির বাপের বাড়ীতে, মেয়ে হলো কল্যাণীর নার্সিংহোমে, মেয়ের আটকড়াইও হলো শুচিদের বাড়ীতে। সাড়ে পাঁচমাসের মেয়েকে নিয়ে টালিগঞ্জের বাড়ীতে প্রথম এলো শুচি – পাঁজি দেখে তার দশদিন বাদেই অন্নপ্রাশনের দিন রেখেছেন শীর্ষর মা আর শুচি বলে দিয়েছে যে অন্নপ্রাশন যদি করতেই হয় তবে টালিগঞ্জের বাড়ীতে, শীর্ষর কল্যাণীর বাড়ীতে নয়। ...

শুচির সেই "আসা" কি সত্যিই আসা ছিলো ? নাকি শুচির মা-বাবার চাপে পড়ে ... ওনারাও বোধহয় ততদিনে বুঝতে পেরেছিলেন যে কিছু একটা চলছে মেয়ে জামাইয়ের মধ্যে !

শুধু শীর্ষই বোঝেনি। সে ভেবেছে "কাজ করবে কাজ করবে করে পাগলামো করছে, দুটো বাচ্চা সামলাতে গিয়ে দু'দিনেই ওসব শখ উবে যাবে আর মাথাও আপনি ঠাণ্ডা হবে" ... মা তো তাই বলেন। আর মা'র কথা যে ভুল হতে পারে ... শুধু ভুল নয়, disastrous হতে পারে, তা তো তখনো ভাবতে পারতো না শীর্ষ।

টালিগঞ্জের তিনখানা ঘরের ঐ ছোট্ট বাড়ীটায় সেই ক'দিন যেন আরো দমচাপা ভাব। মা-বাবা এসে রয়েছেন ক'দিনের জন্যে। শুচি পারতপক্ষে কারুর সাথেই কথা বলছেনা। ছোটঘরটায় মেয়েকে নিয়ে শুচ্ছে ও, শুচির জিনিসপত্রশুদ্ধু ছোট স্যুটকেসটা ছোটঘরেই রয়েছে। বাপ্পা ঘুমোচ্ছে বড়ো ঘরে শীর্ষর সঙ্গে।

মা শুচিকে শুনিয়ে শুনিয়ে নাতি-নাতনীকে আদর করছেন আর বলছেন – "বুঝলি বাবু, শত্রুর পেটে বান্ধবের জন্ম হয়!" শুচি যে কল্যাণীতে এতদিন থেকেও শ্বশুরবাড়ী মাড়ায়নি এবং অন্নপ্রাশন সেখানে করতে দেয়নি, এটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। শুচি কোনো উত্তর করছে না, তাকাচ্ছেও না কারুর দিকে – এতে তিনি আরো অপমানিত বোধ করছেন।

কোনোরকমে ভালোয় ভালোয় অন্নপ্রাশন হয়ে গেলো। বাড়ীর ছাদে ম্যারাপ বেঁধে ব্যবস্থা।

বাড়ীওয়ালা, কিছু বন্ধু, আত্মীয় আর পাড়া-প্রতিবেশী – এদের নিয়ে রবিবারের দুপুরে সামান্য আয়োজন। শুচির মামাতো ভাই মেয়ের মুখে ভাত দিলো, দাদা আসতে পারেনি।

শুচির মা-বাবা কল্যাণী থেকে গাড়ী ভাড়া করে এসেছেন, রাতে থাকবেন না – গাড়ীতেই ফিরে যাবেন।

শুচির মা হাসিমুখে বেয়ানকে অনেক খুশী করার চেষ্টা করলেন।

বাইরের লোকজন সবাই চলে যাওয়ার পরে নীচে নেমে এসে বাড়ীর লোকেদের জন্যে চা করলেন শুচির মা, "আরেকটু বসে যাই" বলে সবার সঙ্গে গল্প করলেন। যাবার সময়ে নাতনীকে কোলে নিয়ে তিনি বললেন – "ভারী মিষ্টি মুখ, ঠাকুমায়ের ধাঁচ পেয়েছে, না শীর্ষ ? মেয়ে হলো পয়মন্ত লক্ষ্মী, এবারে তোমার খুব উন্নতি হবে, দেখো।"

শীর্ষ কিছু বলার আগেই মুখ খুললেন শীর্ষর মা – "আগে অলক্ষ্মী বৌটির ব্যবস্থা করুক তো আমার ছেলে, মেয়ে লক্ষ্মী কিনা সে তারপর বিচার করে দেখবো আমরা।"

ভাগ্যিস অতিথিরা তখন চলে গেছে, তবু শীর্ষ লজ্জিত হলো মা'র কথায় – কেউ শুনলে কি ভাববে ?

কিন্তু যে শোনার সে ঠিকই শুনেছে।

কঠিন মুখে শুচি, এই প্রথম, শাশুড়ীর মুখের ওপর গলা তুলে বললো – "অলক্ষ্মী তার ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনি বরং তার পরের ব্যবস্থাটা করার জন্যে তৈরী হোন।"

ঘরের মধ্যে একটা বোমা ফাটলেও বোধহয় কেউ এতো অবাক হতো না।

শুচির মা তাড়াতাড়ি এসে শুচির মুখে হাত চাপা দিলেন, ধমক দিয়ে বললেন – "এইভাবে তুমি শাশুড়ীমায়ের সঙ্গে কথা বলছো ?"

শুচি কোনো উত্তর না দিয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে ছোটো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

শীর্ষর মা এতক্ষণে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে গলা তুললেন – "ছোটঘরের মেয়ে আনলে এই হয় ! এতোবার ছেলেকে বারণ করেছিলাম পইপই করে ... অসভ্য ঢলানি মেয়ে ... পাড়ার যত ছেলে সব দাদার বন্ধু ... ঘুরঘুর করতো বাড়ীতে ..."

শীর্ষ তাড়াতাড়ি শ্বশুর-শাশুড়ীকে এসে বললো রওয়ানা হয়ে যেতে, না হলে কল্যাণী পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।

শীর্ষর পাঁচদিনের ছুটি এখন। মা-বাবার পরের শনিবার ফেরার কথা। তাঁরা রয়ে গেলেন, যদিও বাড়ী তখন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। শীর্ষ পরে অনেকবার ভেবেছে – যদি সেদিন ও মা-বাবাকেও কল্যাণী পাঠিয়ে দিতো শুচির মা-বাবার সঙ্গে, তাহলেই কি ভালো হতো ? মা হয়তো রাজী হতেন না, হয়তো রাগ করতেন – তবু যদি জোর করে ...! নাঃ, সেসব ভেবে আজ আর লাভ নেই। আর সত্যিই কিছু অন্যরকম হতো কিনা সন্দেহ ... হয়তো হোতো না ?! হয়তো বীজ অনেক আগেই পোঁতা হয়ে গিয়েছিলো ?! হয়তো শুচি জেনে গিয়েছিলো ... কেন যেন বারবার এটাই মনে হয়েছিলো দু'দিন পরে শুচির লেখা ছোট্ট চিঠিটা হাতে নিয়ে।

অন্নপ্রাশনের পরের দিনটা শুচি প্রায় ঘরবন্দী হয়েই কাটালো, মেয়ে নিয়ে। অন্নপ্রাশনের রান্না প্রচুর বেঁচেছে – তাতেই হয়ে যাবে ক'দিন, রান্নার এখন দরকার নেই। মা দূর থেকে যতটা পারেন বাক্যবাণ চালিয়ে গেলেন শুচির উদ্দেশে। এইটুকু বাড়ী – শুচি সবই শুনতে পাচ্ছিলো কিন্তু শুনেও কোনো উত্তর করলো না। শীর্ষ আর বাবা চুপ। মা রেগে গেলে চুপ করে যাওয়াই ছিলো কল্যাণীর বাড়ীর নিয়ম।

তার পরের দিন রাত্রে শুচি মেয়েকে শীর্ষর বিছানায় শোয়ালো – শুচির একটু জ্বর-জ্বর লাগছে, বাচ্চাকে ছোঁয়াচ লাগাতে চায়না ... তাছাড়া শীর্ষরও একটু অভ্যাস হবে রাত জাগা। বাপ্পা গিয়ে শুলো দাদু-ঠাকুমার কাছে। শুচি এক কাপ হরলিক্স খেয়ে আগেই শুতে চলে গেলো, শীর্ষকে মেয়ের দুধের জিনিষপত্র সব দেখিয়ে দিয়ে। রাতে এখন আর ওঠেনা মেয়ে, তবে ভোররাত্রে যদি ওঠে !

ভোররাত্রে সত্যিই মেয়ের কান্নায় ঘুম ভাঙলো শীর্ষর। অপটু হাতে দুধ বানিয়ে এনে মেয়ের মুখে দিলো। দুধ খেতে খেতে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। কাঁচা ঘুম ভাঙার ক্ষতিপূরণ করতে শীর্ষ আবার একটা টানা ঘুম দিলো।

ঘুম যখন ভাঙলো ঘড়িতে তখন প্রায় বেলা সাড়ে আটটা, রোদ এসে পড়েছে ঘরে। কাজের মেয়ের গলা শোনা যাচ্ছে, সঙ্গে বাপ্পার। বাপ্পা স্কুলে যায়নি আজ ?

চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে শীর্ষ বাপ্পাকে বললো – "একি ? তুমি বাড়ীতে কেনো? স্কুলে যাওনি ?"

বাপ্পা মহানন্দে দাদুর চায়ের কাপে বিস্কুট ডোবাতে ডোবাতে বললে – "মা ডাকেইনি! কে তৈরী করবে আমায় ? মা'র জ্বর তো! আমারও ছুটি আজ।"

শীর্ষ শুচির খোঁজ নিতে ঘরে এলো। শুচি ঘরে নেই। তবে কি বাথরুমে? না, মা বেরোচ্ছেন বাথরুম থেকে চান করে ... শুচি নয়। কাজের মেয়েকে জিগেস করে জানলো যে রোজের মতো আজ বৌদি দরজা খুলে দেয়নি – দরজাটা খোলাই ছিলো, ভেজানো। ও ভেবেছে বৌদি খুলে দিয়ে বাথরুমে গেছে, ও এসে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আবার ছোটো ঘরে গিয়ে ঢুকলো শীর্ষ, আর তখনই চোখে পড়লো যে শুচির ছোটো স্যুটকেসটাও ঘরে নেই। আর ... টেবিলের ওপরে গেলাস চাপা দেওয়া একটা কাগজ। যদিও জীবনটা সিনেমা নয়, তবু সিনেমায় দেখা এইরকম সিনগুলোর কথা ভেবে শীর্ষর বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো।

কাগজটা খুলে দেখলো শুচির হাতের সেই ঈষৎ জড়ানো লেখা – "চল্লাম। ভেবেছিলাম ক'মাস আগেই, করে উঠতে একটু সময় লেগে গেলো। বলেছিলে ব্যানার্জ্জী বাড়ীর সন্তানদের ওপর আমার ছায়া পড়লে ওরা মানুষ হবে না, তাই ওদের ব্যানার্জ্জী বাড়ীতেই রেখে গেলাম – আশাকরি সুশীল এবং লক্ষ্মীমন্ত হবে।"

তারপরের কয়েকমাস যে ঠিক কিভাবে কেটেছিলো সেটা এখনও স্মৃতিতে অস্পষ্ট।

শুচির মা-বাবাও সাহায্য করতে পারলেন না। মেয়েকে তাঁরা একেবারেই প্রশ্রয় দেননি, ফেরত যেতে বলেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। শুচি জানিয়েছিলো যে সে ফেরার জন্যে ঘর ছাড়েনি, উঠেছিলো গিয়ে কল্যাণীতেই এক বন্ধুর বাড়ীতে।

কিছু ব্যস্ত-ত্রস্ত ফোন ... কিছু এলোমেলো কথা ... শুচি কিন্তু ধরাছোঁওয়ার বাইরেই রইলো ... হিমালয়ের চূড়ার মতো ... দুর্গম, হিমশীতল। সে যে কি ভাবছে শীর্ষ তা জানতেও পারলো না – কথাই বলতে পারলো না সে শুচির সঙ্গে একবারের জন্যেও।

শীর্ষর মা প্রথম থেকেই বদ্ধপরিকর যে "শুচি এখন থেকে মৃত এই বাড়ীর জন্যে"! "ব্যানার্জ্জী বাড়ীর বাইরে একবার পা ফেললে আর ভেতরে ঢোকা যায়না" – শুচির চিঠিটা হাতে নিয়েই মা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। মা'ই বোঝালেন বাপ্পাকে, সামলালেন শিশুকন্যাকে যতদিন না অন্য ব্যবস্থা হলো – আর সন্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো মহাপাপ যে করে সে যে কতবড়ো চরিত্রহীনা, এটাই বারবার বুঝিয়ে যেতে লাগলেন শীর্ষকে।

শীর্ষ কি কিছু বুঝছিলো ? কিছু শুনছিলো ? শীর্ষর তো মাথাতেই কিছু ঢুকছিলো না ! ও খালি ভেবে যাচ্ছিলো যে কল্যাণী থেকে টালিগঞ্জ আর কতোদূর ? রাগ পড়লেই ফিরে আসবে। নাহয় শীর্ষই একদিন চলে যাবে কল্যাণীতে – কেউ জানতে পারবে না। শুচিকে বুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে আসবে, মা-বাবাকে তার আগে কল্যাণীতে পাঠিয়ে দেবে। ... আজ ভেবে হাসি এলো শীর্ষর – জীবনটা যদি সত্যি এতো সহজ হোতো !

কল্যাণীর সব চেনা বাড়ীতে খোঁজ-খবর করতে করতে শেষে গীতার মতো বয়স্ক এবং বিশ্বস্ত একজন লোক পাওয়া গেলো। ছেলে-মেয়েরা গীতামাসীর কাছে অভ্যস্ত হলো – মা-বাবা কল্যাণী ফিরে গেলেন। এইবারে শীর্ষ একদিন দুপুরে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সোজা চলে গেলো শুচির বন্ধু দীপার বাড়ী, কল্যাণীতে। কলিংবেলে যখন হাত রাখলো, বুকটা তখন কাঁপছে – একমাস হয়ে গেছে ... শুচির রাগ কি এখনো পড়েনি ?

ভাবতে ভাবতেই দীপা এসে দরজা খুললো।

শীর্ষকে দেখে বললো – "শীর্ষদা আপনি ? ... শুচি তো বম্বে চলে গেছে একটা কাজ নিয়ে, জানেন না ?"

শীর্ষ অবাক হয়ে বললো – "বম্বে ? ... কোন জায়গায় ? উঠেছে কোথায় ?"

দীপা একটু ইতস্তত করে বললো – "আপাতত সুশোভনদা'র ওখানে উঠেছে, তারপর ... আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন! আসুন না, বসুন। একটু চা খেয়ে যান।"

"আজ থাক" বলে দরজা থেকেই ফিরে এলো শীর্ষ। সোজা টালিগঞ্জ। নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে একবার দেখাও করলো না।

এতদূরে চলে গেলো শুচি – বম্বে ?! কিছু জানালোও না ! এরপর শীর্ষও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো যে "মৃত"ই এই সম্পর্কের সঠিক নাম হওয়া উচিত, আর কোনোভাবেই কোনো পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। তাই কয়েকবছর পর যখন দীপা ফোন করে বলেছিলো যে শুচি একবার এসে কথা বলতে চায়, তখন সেটাকে শুচির "স্পর্ধা" ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। সুতরাং অবশেষে বিচ্ছেদ। চিরদিনের মতো।

অনেক যুদ্ধ ... অনেক মাথাহেঁট ... অনেক অচেনা বাঁক ... অনেক নির্ঘুম রাত ...!

আজও মনে হচ্ছে ঘুম আর আসবে না। জোর করে চোখ বন্ধ করে ঘুমের চেষ্টা করলেন শীর্ষ। প্রেশারটা বেড়েছে আবার, ওষুধ বদলের দরকার কিনা ডাক্তারকে জিগেস করতে হবে।

(চলবে)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য

পুরোনো দিনের কথা

পর্ব ৩

পুরোনো কলকাতার গল্প – আমার জীবণ স্মৃতি, আট দশক পূর্বের কাহিনি

আমার ছোট পিসিমার বাড়ী ছিল আপার সার্কুলার রোডে – যেটি এখন এ পি সি রোড নামে পরিচিত। বাড়ীর নম্বর এখনও মনে আছে, ২৮৬। এটি গড়পার রোড যেখানে বড় রাস্তায় পড়েছে ঠিক সেই সংযোগস্থলে। রামমোহন লাইব্রেরি এর পাশেই। বাড়ীটি দোতলা, ওপরে পিসেমশায়ের পরিবার, নীচে তাঁরই আত্মীয়রা থাকতেন। এই বাড়ীতে আমরা বহুবার গেছি, এবং যেহেতু আমার দাদু শেষ বয়সে অনিবার্য কারণে এই বাড়ীতেই তাঁর ছোট মেয়ে জামাই-এর কাছে ছিলেন, সেই সুবাদে আমরাও অনেকদিন ওখানে ছিলাম। বাড়ীটি বড় রাস্তার ওপর হলেও ওখানকার সব বাড়ীর সামনে ছোটখাটো মাঠের সমান প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা, তারপর বড় রাস্তা। বড় প্রতিষ্ঠান, যেমন মূক-বধির স্কুল, ডেন্টাল কলেজ ইত্যাদি ছাড়া সাধারণ কোন বাড়ীতে পাঁচিল ছিল না, সদর দরজা খুললেই জনসাধারণের পায়ে চলার রাস্তা। ফুটপাথের এই ফাঁকা জায়গাটির ওপর দিয়ে রেল লাইন পাতা, লাইনটি বাগবাজার গঙ্গার ধার থেকে শুরু হয়ে আপার সার্কুলার রোড ধরে রথের মেলার মোড় বেঁকে এন্টালি হয়ে ধাপায় শেষ হয়। এর ওপর দিয়ে দিনে দুটি ট্রেন যেত। আমরা ছোটরা কৌতূহলভরে বাড়ীর দোতলার জানলা দিয়ে দেখতাম একটু বেলায় কু-ঝিক-ঝিক করতে করতে একটি ছোট স্টীম ইঞ্জিন তিনটি মালগাড়ীকে টেনে বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছে ! এটি ছিল শহরের জঞ্জাল-আবর্জনা বয়ে নিয়ে যাবার ট্রেন। গোটা কয়েক 'স্টেশন'ও ছিল মাঝে মাঝে সেখানে নিকটবর্তী স্থানের ময়লা জড়ো করা থাকতো ঐ মালগাড়ীতে ফেলার জন্য। বখাটে ছেলেরা এর নাম দিয়েছিল ধাপা মেল! পরশুরামের কজ্জলী বইয়ে কচি সংসদ গল্পটিতে এর উল্লেখ আছে। তখন ট্র্যাম লাইন রাস্তার মধ্যে পাতা ছিল, এখন তো একপাশে হয়ে গেছে। বাস সবই বেসরকারী, বিস্কুটের টিনের মতো দেখতে। তিন নম্বর বাস তখন খুব জনপ্রিয় রুট, শ্যামবাজার থেকে চৌরঙ্গী, ভবানীপুর হয়ে টালিগঞ্জ যেত। দোতলা বাসও ছিল, তবে টিনের বডি, পরের সরকারী বাসের মতো সুদৃশ্য নয়।

পিসিমার বাড়ীটিতে সব মিলিয়ে ৬/৭ জন ছেলে থাকত নানা বয়েসের, তবে বেশির ভাগই স্কুলের ছাত্র। রোজ বিকেল বেলা বাড়ীর সামনের জায়গায় দুটি চৌকি পাতা হতো, আর ছেলেরা নরক গুলজার করে আড্ডা দিত, মোহনবাগান-ঈস্ট বেঙ্গল-এরিয়ান-মহামেডানের খেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা চলতো, ব্র্যাডম্যান ইংল্যান্ড বোলারদের কি পেটাচ্ছেন, সিনেমা থিয়েটারের নায়ক-নায়িকাদের অভিনয়ের প্রশংসা বা নিন্দা, সায়গল বা পঙ্কজ মল্লিকের সিনেমার গান, আমরা ছোটরা হাঁ করে শুনতুম, মাঝে মাঝে গলা নামিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বা যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি বলাবলি হতো, বলা তো যায় না কোথায় পুলিশের গুপ্তচর ওৎ পেতে আছে, ধরলেই জেলে পুরে দেবে বিপ্লবী বলে। এর মধ্যে আবার খাবারও আসতো, রাস্তার উল্টোদিকে সুকিয়া স্ট্রীটে – এখন মনি শ্রীমাণি স্ট্রীট – বাঁ ফুটপাথে একটি তেলেভাজার দোকান ছিল ও পাড়ায় প্রসিদ্ধ, সেখান থেকে। ছেলেদের তো ভাঁড়ে মা ভবানী, মা-মাসীদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে যা যোগাড় হত তাই দিয়ে মুড়ি-বেগুনী-আলুর চপ আসতো, তাই সবাই ভাগাভাগি করে খেয়ে কি আনন্দ ! মা'র মুখে শুনেছি বেগুনী-আলুর চপ ১ পয়সা, ২ পয়সা করে ছিল, (১ টাকা = ৬৪ পয়সা) ওঁরাও খেতেন কি না আলাদা আনিয়ে ! কাজেই ৮/১০ আনার খাবারে, অর্থাৎ এখনকার ৫০/৬০ পয়সার খাবারে পাঁচ-ছ জনের সংকুলান হয়ে যেত। আর যেদিন জ্যাকপট প্রাপ্তি হত, মানে হঠাৎ উদার হয়ে যাওয়া বাবা-কাকার কাছ থেকে টাকাটা-সিকেটার প্রাপ্তিযোগ হতো সেদিন তো রীতিমতো ফিষ্টি! তেলেভাজার দোকানের ঠিক উল্টো ফুটপাতে চপ-কাটলেটের দোকান থেকে আনা হতো মাংসের চপ, চিংড়ীর কাটলেট বা ডিমের ডেভিল। এই শেষোক্তটির এখন বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না, যদিও সেদ্ধ ডিমের ওপর পুরু করে মাংসের কিমার

আবরণ দিয়ে ভাজা খাবারটি অতি উপাদেয়। বহু বছর পরে বিলাতে বসবাসকালীন সময়ে একটি কাফেটেরিয়ায় এই জিনিস আবার খেয়েছিলাম, তার ওদেশী নাম স্কচ এগ (scotch egg), তবে সেটি দেশের জিনিষের চেয়ে নিরেশ লেগেছিল, অবশ্যই মশলার তারতম্যের জন্য। যাই হোক, তেলেভাজার চেয়ে এগুলির দাম অনেক বেশি – এক একটা দু আনা, ৪ আনা অথবা এখনকার মুদ্রায় ১২ বা ২৫ পয়সা বলে বেশি আনা যেত না, এক একটি খাবার দুই বা তিন টুকরো করে নেওয়া হত যাতে সবাই ভাগ পায়, সেটুকু খেয়েই আমরা সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে যেতাম ! কাছেই মাণিকতলা বাজার, তবে পিসেমশায় ছেলেদের নিয়ে শেয়ালদা বাজারে যেতে ভালবাসতেন জিনিসপত্র ওখানে আরো সস্তা বলে, পাইকারি হারে দশ সের আলু ২ টাকায় পাওয়া যেত ! সেই আলু ছেলেরা পালা করে বয়ে আনতো !!

পাশেই গড়পার রোড। সেখানকার বিষ্ণু ঘোষের ব্যায়ামের আখড়ার শহরব্যাপি খ্যাতি ছিল। আখড়ার ছেলেদের ব্যায়ামপুষ্ট শরীর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। সাধারণ ভাত-ডাল খেয়েও – বেশির ভাগ ছেলেই অতি মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসতো – যে এমন সুস্থ সবল শরীর গঠন হতে পারে তা বিশ্বাস করাও কঠিন হত। ইংরেজ সাহেবরাও অবাক হয়ে প্রশংসা করত এই ছেলেদের। এদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছিলেন মনতোষ রায়, মনোহর আইচ প্রমুখ, যাঁরা বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে মিঃ ইউনিভার্স আখ্যা লাভ করে দেশকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। পরে ১৯৪৬ এর প্রাণঘাতী দাঙ্গায় বিষ্ণু ঘোষ ও তাঁর আখড়ার ছেলেরা অসমসাহসিকতায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে গিয়ে যে কত অসহায় পরিবারকে গুন্ডার হাত থেকে রক্ষা করে নিজেদের আখড়ায় নিয়ে গিয়ে আশ্রয় ও আহার দিয়ে নিশ্চিন্ত করেছেন তার কোন হিসাব নেই। আমার রাজাবাজার নিবাসী এক মাসীমার পরিবারের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবং তাঁদের রক্ষাকর্তা হয়েছিলেন শ্রী বিষ্ণুচরণ ঘোষ স্বয়ং। ভবানীপুরে পরে ওঁদের মুখ থেকে সব ঘটনা জানা যায়। এই কীর্তি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো, অথচ আমরা কত জনই বা জানি !

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ফলে কলকাতাবাসীরাও অতি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়া ছাড়াও অনেক জিনিস, বিশেষতঃ আমদানী করা সাধারণ ব্যবহারের সামগ্রীরও ঘাটতি দেখা গেল – এখানে মনে রাখতে হবে তখন এদেশে কল-কারখানা ছিল খুবই কম, বৃটিশ সরকার উৎসাহও দিত না এখানে উৎপাদন বাড়াবার জন্য যাতে ওদের তৈরি সাধারণ জিনিসের জন্যও আমরা ওদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হই। ফলে স্নো, পাউডার, বিস্কুট, মাখন ইত্যাদি, বিশেষ করে ম্যানচেষ্টারের কারখানার বস্ত্রাদির মত নিত্যব্যবহৃত জিনিসেরও বাজারে অভাব দেখা দিল। গান্ধিজী বিলিতি কাপড় বর্জন করে দিশী খদ্দরের কাপড় ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন কিন্তু চাহিদার তুলনায় তার সরবরাহ কম ও মিলের কাপড়ের তুলনায় মোটা ও কম আরামদায়ক বলে সে কাপড় জনপ্রিয় হলো না, স্বদেশ প্রীতি সত্ত্বেও! তখন ঘানীর সর্ষের তেল ও গাওয়া ঘী দিয়েই রান্না হতো তবে ঘী'র দাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় দালডা বনস্পতি ঘী এর বিকল্প হিসাবে খুব চলতে লাগল। তেলে লুচি, কচুরি ভাজা তো অকল্পনীয় ছিলো! বিজ্ঞাপন বেরোলো, ডালডা বনস্পতি, তুমিই অগতির গতি ! খাদ্য-দ্রব্যের অপ্রতুলতার জন্য এই প্রথম রেশন ব্যবস্থা চালু হল, লোকেরা বলতো কনট্রোলের দোকান। এ পর্যন্ত সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারেরা সুখে না থাক স্বস্তিতে ছিল, বিলাসে না থাক মোটা ভাত-কাপড় এবং মাথার ওপর একটি ছাতের সংস্থান ছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা, একটা নিশ্চিন্ততা, নিরাপত্তার বাতাবরণ ছিল, শত অভাব-অনটন ও দৈনন্দিন সমস্যা সত্ত্বেও । অদূর ভবিষ্যতে যে কি ভয়ংকর, সর্বনাশা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

তখন যুদ্ধের পরিস্থিতি অতি সংকটজনক। জাপানীরা চীনকে পর্য্যুদস্থ করে বর্মা অধিকার করে নিয়েছে, অর্থাৎ একদম ভারতবর্ষের দুয়ারে ! মণিপুর-ইম্ফল ঘোর আশংকায়। জাপানীদের পরবর্তী লক্ষ্য কলকাতা। এই শহর তখন মিত্রপক্ষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, কলকাতা বন্দরে পর পর জাহাজে অস্ত্র-শস্ত্র, অন্যান্য সামরিক দ্রব্য, আমেরিকা থেকে লরী, জিপ, ভ্যান, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রভূত পরিমানে আসছে। ওদিকে হাওড়ায় সারি সারি ট্রেনে সৈন্যের দল ও তাদের ব্যবহারের জন্যে হরেক জিনিষপত্র ও টিনের খাবার আসছে। দমদম বিমানবন্দর পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর দখলে। এখান থেকেই মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী ও বিমানবাহিনী শত্রুদের আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং কলকাতাকে অচল করতে পারলে জাপানীদের বিরাট লাভ ও মিত্রশক্তির ক্ষতি।

ডিসেম্বর মাস, ১৯৪২। জাপানী বিমান হানা দিল কলকাতায়। পরপর বোমা পড়ল শহরে – কলকাতা বন্দরে, গড়ের মাঠে, হাওড়া ব্রীজে, হাতিবাগানে। প্রচুর লোক হতাহত হল, আর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল বন্দর, কয়েকটি জাহাজ ডুবলো, বড় মাল তোলার ক্রেন অচল হল। দাবানলের মতো ভীতি ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরে, লোকেরা প্রাণভয়ে দিক-বিদিক লোপ পেয়ে বাড়ী-ঘর তালাবন্ধ করে শহর ছেড়ে পালাতে লাগলো, যে যেখানে পারে! বহুদিনের বিস্মৃত দেশ-গ্রামের বাড়ী, বাইরে থাকা আত্মীয়দের নিবাস, সে যতই দূর সম্পর্কের হোক না কেন, সেই সবই তখন অগতির গতি, নিরাপদ আশ্রয়।

এদিকে যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তারা মাটি কামড়ে ঈশ্বরের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে রইলো জনহীন শহরে। রাত্রে পুরো ব্ল্যাক-আউট, সন্ধ্যা হলেই কার্ফু, বাড়ীর বাইরে বেরোনোর উপায় নেই, রাস্তায় মিলিটারী ট্রাক বেপরোয়া গতিতে যাতায়াত করছে। প্রশাসনের কড়া নির্দেশে সব বাড়ীর কাঁচের জানলা মোটা কাগজ দিয়ে ঢাকা, যেন ভেতরের এক বিন্দু আলোও বাইরে থেকে না দেখা যায়। অফিস-কাছারী, দোকান-পাট, স্কুল-কলেজ-কোর্ট সব হয় বন্ধ, নয় টিম টিম করে চলছে লোকাভাবে। অনেকে বড় বড় বাড়ী স্রেফ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নামমাত্র টাকায় ভাড়াটে বসিয়ে পালালেন। এই অবস্থায় দাদামশাই আমাদের সবাইকে নিয়ে তাঁর দেশের বড় বাড়ীতে, জয়নগর-মজিলপুর গ্রামে, উঠলেন, দুই পুত্র ও কলকাতা-নিবাসী চার কন্যা ও তাদের পুত্র-কন্যা সহ। বাকী চার কন্যার বাড়ী ভারতের অন্যান্য শহরে, অতএব নিরাপদ। মা ও আমিও ছিলাম সঙ্গে যেহেতু বাবা তখন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে, কাজেই মা তখন বাপের বাড়ীতে। মজিলপুরের বাড়ী ভর্তি, আমরা তখন সব মিলে কুড়ি-পচিঁশজন লোক, হৈ-হট্টগোলের শেষ নেই, যেন আমরা সবাই বিদেশ ভ্রমণে এসেছি, সব চিন্তা-ভাবনা শিকেয় তুলে রেখে ! আমাদের ছোটদের খেলার শেষ নেই, তবে রাত্রি হলেই হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো-অন্ধকারে ভূত-প্রেতের গল্প শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম মনে মনে রাম নাম জপ করতে করতে !

এদিকে বড়দের জমাট তাসের আসর বসতো আর আড্ডা, হাসি-মস্করা তো আছেই। সবচেয়ে ভালো লাগত সন্ধ্যার সময়ে গানের আসর – সবাই মিলে, মা-মাসিরা সুদ্ধু সমবেত কণ্ঠে তখনকার সিনেমার গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে বাড়ী মাতিয়ে রাখতেন। বিশেষ করে আজও মনে পড়ে 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়', 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান', 'পৃথিবী আমারে চায়' (ছবি বিশ্বাসের কণ্ঠে সিনেমার গান), 'ভাল না লাগে তো দিয়ো না মন' (কানন দেবীর গান) এবং অবধারিত ভাবে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' দিয়ে সমাপ্তি ! মাঝে মাঝে দিদিমার ফরমাশে, 'হরি দিন যে গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে' বা অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের 'ফিরে চল আপন ঘরে' ! তাও হতো, যদিও সমবেত কণ্ঠে নয় ! !

কত স্মৃতি যে মনে ভীড় করে আসে ! পুরোনো কলকাতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত কাহিনি জড়িয়ে আছে

হে অতীত কথা কও ....

আর আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি !

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য – (বয়স – ৮৪+) তৎকালীন মাইশোর প্রদেশে ইউরোপীয়ান হাই স্কুলের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান প্রাপ্তির পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাস (১৯৫৪-৫৮)। তৎপরে একটি আড়াই-বছরব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ ট্রেনিং কোর্স ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারে এ.ই.আই কোম্পানীতে। সিইএসসি তে একাদিক্রমে ৩৪ বছর কর্মের পর ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৯৭)। অবসর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়া, ফটোগ্রাফী, ও ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা ও ইদানীং বাংলা ও ইংরাজিতে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত রম্য-রচনা লেখায় ব্যাপৃত।

মমতা দাস (ভট্টাচার্য)

আব্দুল চাচার লড়াই

পর্ব ৩

গল্পের রেশ নিয়ে ঘুমাই আজকাল, সকালে উঠেও রেশ কাটেনা। ছুটে আসি চাচার বাড়িতে গল্পের খিদে নিয়ে! মানুষের গল্প, জীবনের গল্প – এমন গল্পে খুব টান ! বানিয়ে প্রেমের গল্প বলতে, শুনতে আমার ভালো লাগে না ! মানুষের আসল লড়াইয়ের গল্প আমাকে বেশী টানে ! শুনছি আমিনার শ্বশুর বাড়িতে তার জীবনযাত্রার কথা ! পয়সাওয়ালা মানুষ তারা, বৌদের কাজকর্ম বিশেষ করতে হয় না, ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, রান্না সব কিছুর জন্য লোক আছে। বৌ'রা তবে করে কি ? কেন সাজ-গোজ, নিজের ঘষা-মাজা, রূপচর্চা, কাজ কি কম ? বৌদের সবসময় নাকি সেজেগুজে থাকতে হয়, তাহলেই নাকি স্বামী ভালবাসে, স্বামী বশে থাকে ! তা থাকে হয়ত সত্যি, কেননা পয়সা থাকা সত্ত্বেও এদের ঘরের কোন পুরুষ একটার বেশি বিয়ে করেনি, সেটা কি কম ? করলেই বা কি করার ছিল ? সাধারণ ঘরের মেয়েরা বউ হয়ে এসেছে, বড়লোকের ঘরের বউ হয়েই ধন্য তারা। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কোন সিদ্ধান্ত মেনে না নেওয়া বা বিরোধীতা করা তাদের চিন্তায় নেই ! এ বাড়ির বৌ'রা তাই কৃতার্থ হয়ে থাকে, বাদামবাটা, সরবাটা, কাঁচা হলুদ বাটা মাখে যাতে সোনার অঙ্গে চোখ ঝলসানো জৌলুস আসে ! চুল রিঠা দিয়ে ধোয়, নারকেল তেল গরম করে মাখে যাতে মেঘের মত কালো একরাশ চুল হয় ! করবে নাই বা কেন ? কিছুইতো নিজের হাতে করতে হয় না, জনে জনে বৌদের খেদমত খাটার আলাদা লোক আছে যে ! একটু নিজেকে ভালবাসার বিলাসীতা হয়ত ! সেই মেয়েগুলো কিন্তু আড়ালে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে – 'অত কান্ড বরকে খুশি করতে, তবু সেই ব্যাটাছেলেরা আমাদের মত কালোকেলোদের পিছনেই ছোটে কেন রে ?' – প্রবীণা আরেকজন বলে – 'কিন্তু গতর নাড়ে না যে ! পুরুষমানুষ আসলে যা চায়, বাবুদের ওই পাখির মত মেয়েগুলার কই রে ? শরীর খাটালে তবে তো শরীর তৈরী হবে ! আতুপুতু করে শরীর হয় ? ব্যাটাছেইলেরা মজ্যে দ্যত'.... বলেই এক চিমটি দোক্তারগুড়ো মুখে ফেলে সে, কম বয়সী মেয়েগুলো সব হেসে গড়ায় ! বড়লোকের বিবিরা জানতেও পারে না, তাদের বরদের কৃতিত্ব আর কাজের মেয়েদের হাসাহাসির খবর পালঙ্কে সুখে ঘুমায় !

এতো গেল রূপচর্চার কথা, যদি কোনো বউ-এর সন্তান হয়ে যায়, তার আবার অন্য গল্প। সারাদিন নানা ব্যস্ততা, সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব ! নিজেকে ঠিক রাখতে হবে, কারণ সন্তান হয়ে গেলেই নাকি বরের টান কমে যায়, তাই নিজের জেল্লা আরো বাড়াতে হবে সেই চিন্তা সারাদিন। তারসঙ্গে বাচ্চাটার-ও যাতে অযত্ন না হয়, সে খেয়াল রাখা, ধকল কম ? কোনকিছুই গায়ে খেটে করতে হয় না, সব কাজের আলাদা লোক, তবু দায়টা তো বৌ'টার-ই ! বেচারা মেয়েগুলো মধ্যবিত্ত ঘর থেকে, বড়লোকবাড়ির বউ হয়ে এসে তটস্থ হয়ে থাকে ! বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে রেহাই নেই, মা-বাপ তুলে গালাগাল, এমনকি গায়ে হাত তোলাও জলভাত ! এই তো জীবন এদের বাড়ির বৌদের, সেখানে এসে পড়েছে আমিনার মত সাদাসিধা, লেখাপড়া অন্তপ্রাণ মেয়ে, কি যে কঠিন পরিস্থিতি ! শান্ত, সভ্য, নম্র আমিনার হিমশিম অবস্থা ! কি করে যে সামাল দেবে সেই চিন্তায় জেরবার ! ওসব রূপচর্চা-টর্চার ধার ধারে না সে। সময় নষ্ট না করে দুটো বই পড়তে পেলেই খুশি ! কিন্তু তার সেই খুশি-ই তো এদের চক্ষুশূল – 'মেয়েমানষের আবার এত পড়া কিসের ? আপিসে কাজ কইরবে নিকি ? না সংসারের হিসাব নিয়া বৈসবে ? ছেইল্যেটা আমার মনমরা হইয়ে ঘুইরে বেড়ায়, বউ-দুটো ভালোবাস্যার কটা কয়নি গো ! এই বৈসে পিরীত বড় না পড়া শুনি' – জানতে চায় আমিনার শাশুড়ি, অন্য মহিলারাও মাথা নেড়ে সায় দেয়। খুব সত্যি, এর ভিতরের নির্মমতার কথা এইসব মহিলার মনেও আসে না। তারা তো জন্ম থেকে এসব শুনেই বড় হয়েছে ! কিন্তু আমিনা এসব কথার মানেই বোঝে না, সে যে ছোট্ট বেলা থেকেই লেখাপড়া নিয়ে মগ্ন থেকেছে, সংসারের ছোট-বড় কথা তার জানা নেই। তা সেটাওতো অশান্তির একটা বড় কারণ ! মেয়ে মানুষ সংসারের ছোট-বড় কথা জানেনা, বোঝে না সে কেমন কথা ? আর এই জন্য দোষী কে ? আমিনার মা, আবার কে ? সেও যে একজন মহিলা, সুযোগ পেলে তাকেও কি ছেড়ে

দেওয়া হবে ? অতএব শাশুড়ি, ম্যায় বাড়ির পুরুষরাও দিনরাত আমিনার মাকে দুষছে। বিয়ের পর মা'র নিন্দা শুনতে একজন মেয়ের কত খারাপ লাগে, সেকথা কে ভাবে ? কেনই বা ভাববে ? মেয়ে বই তো নয় ! মেয়েদের আবার মন ! সমাজ মেয়েদের মনের ধার ধারে না ! এমন-ই চলছে সেই বিয়ের পর থেকে। যত শোনে, দুঃখ ভুলতে আমিনা তত পড়ায় ডুবে যায়। যত সে পড়ায় ডোবে, তত কথার হুল বাড়ে, শারীরিক অত্যাচার মাত্রা ছাড়ায়,আমিনা কিন্তু হার মানেনা ! তার সহনশক্তি যে তার দুর্বলতা নয়, সেটাই কেউ বোঝে না। যত বাধা আসে তত প্রতিজ্ঞায় অনড় হয় আমিনা, লেখাপড়া সে করবেই জগতের কোন শক্তি তাকে দমাতে পারবে না ! ঘনিয়ে ওঠে দুর্যোগ কিন্তু সে গল্প পরে!

সেই যে শুরু আব্দুল চাচা আর তার মেয়ে আমিনার লড়াইয়ের কাহিনি, শুনেই চলেছি। কাহিনি-ই বটে, একজন গেরস্ত চাষি আর তার শান্ত, নম্র বুদ্ধিমান মেয়ের লড়াই পরিবারের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, বেনিয়মের বিরুদ্ধে ! আমার যেন নেশা ধরে গেছে ! আমি মুগ্ধ, আমি বিস্মিত ! ওই দ্যাখো আমিও বলছি মুগ্ধ, কেন ? এটাই তো স্বাভাবিক ! একটা বুদ্ধিমতী, মেধাবী মেয়ে পড়তে চাইবে, সেটাই তো স্বাভাবিক ! দরকার হলে লড়াই করবে, সেটাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমাদের মনকে নিয়মের বেড়াজালে এমন বাঁধা হয়েছে যে, একটু অন্যরকম কিছু দেখলেই আমাদের মনে হয় একটা আশ্চর্য কিছু ! মুসলমান সমাজের মেয়েদের লেখাপড়া না করাটা, এবং না করা মেনে নেওয়াটা এত স্বাভাবিক লাগে আমাদের যে তার বিপরীত কিছু দেখলেই আমরা অবাক হই ! হাস্যকর কথা, কিন্তু সত্যি ! এমনই আমাদের মাইন্ডসেট ! আমি লেখার জগতে আছি, কতরকম লড়াই দেখে অভ্যস্ত, তবু আমিনা আর তার নিরক্ষর বাপের বিদ্যার জন্য লড়াইটা আমাকে অবাক করে, চমৎকৃত করে ! যাই হোক আমিনাদের গল্পটা বলি –

এখনো যে দেশে, অর্ধেকের বেশি মেয়ে একটা অন্ধকার বন্ধ জীবন যাপন করে, স্বইচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে ! সমাজ সুরক্ষার দায়িত্ব নেয় না বলে, কন্যা-সন্তানের মা-বাবা যত তাড়াতাড়ি পারে, মেয়েকে পাত্রস্থ করে দায়মুক্ত হয় ! স্বামী মাতাল, বদরাগী, দুশ্চরিত্র যাই হোক না কেন, তাই সইতে হবে। মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। ইচ্ছা-অনিচ্ছা তৈরী হওয়ার আগেই তো বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। আইনত মেয়েদের বিয়ের বয়স আঠারো, কিন্তু গাঁয়ে-ঘরে কেই বা সেটা মানে ? পনেরো বছর বয়স হলেই মেয়ে সামলানো একটা গুরু দায়িত্ব হয়ে পড়ে!মেয়ের দোষ থাকুক বা না থাকুক, সামান্য কিছু ঘটলেও মেয়ে কিন্তু দাগী হয়ে যাবে ! তখন আর মা-বাবার কিছুই করার থাকবে না, এমন-ই আমাদের সমাজব্যবস্থা ! আজকাল অবশ্য অনেক মেয়েই বিয়ের কথা হলেই প্রতিবাদ করে, লেখাপড়া করতে চায়। কেউ কেউ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অন্য কোনো শুভানুধ্যায়ীর সাহায্যে পুলিশের কাছে পৌঁছয় ! কিন্তু সে আর কজন ? অনেকসময় পুলিশ নিতেই চায় না নালিশ, তারাও তো এই সমাজের লোক মনটা এক-ই রকম। তা ছাড়া তাদের তো থাকতেও হবে এখানেই ! কাজেই মেয়েদের অবস্থা বদলায় না। যুগের পর যুগ চলতে থাকে অন্যায়-অবিচার ! তার মধ্যেই যদি কেউ মাথা তোলার চেষ্টা করে, আমিনার মত অসম লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হয় !

শ্বশুর বাড়িতে যত বিরুদ্ধ পরিবেশ জোরদার হয়, আমিনার লেখাপড়ার জেদ ততই বাড়ে। তার জেদ যত অনড় হয়, অপরপক্ষে বিরুদ্ধতা আরো বাড়ে, এ যেন এক ভিসিয়াস সাইকেল, একটারসঙ্গে আরেকটা অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আমিনার বন্ধু গোলাপী খবর আনে, আর আব্দুল চাচার মন দমে যায়। অনেক কিছুই বলে গোলাপী, তবু চাচার মনে হয় অনেক কিছু সে মেয়ে বলেও না, চেপে যায় ! মেয়ে মনের স্বাভাবিক চেতনায় তার মনে হয় বন্ধুর সংসারের সমস্ত অবিচারের কথা শুনলে তার বন্ধুর বাবা সইতে পারবে না। তাই কিছুটা বলে, অনেকটা বলে না। রেখে-ঢেকে যতটা না বললেই নয়, ততটাই বলে। কিন্তু ছেলেমানুষ মেয়ে জানে না, তার মুখ-চোখ আরো অনেকটা না বলা কথা বলে দেয়। আমিনার বাবার বুঝতে বাকি থাকে না যে, সেখানে কি ঘটছে ! সেই শত্রুপুরীতে বন্দিনী কন্যার মত তার মেয়ের অবস্থাটা সে মানস চক্ষে দেখতে পায়। গোলাপীকে সে কিছুই বলে না, বাচ্চা মেয়েটাকে অকারণ উদ্বেগ দিয়ে কি লাভ ? আসলে মেয়ের বাবা আর মেয়ের বন্ধু দুজনেই দুজনের দৃষ্টি এড়ায়, দুজনেই অন্যকে চিন্তার হাত থেকে বাঁচাতে চায়। আবার দুজনেই মনে মনে বোঝে যে, অন্যজন সেই সকরুণ কপটতা ধরতে পারছে !

যা হোক জীবন নয় নয় করেও চলেছে, আব্দুল চাচা ভেবেই চলেছে মেয়ের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা কি করে করবে ! বিবাহিতা মেয়ের শ্বশুরবাড়ির অমতে সেটা কি সম্ভব হবে ? আর সেরকম করাটাও কি সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ হবে না ? ভারতবর্ষের মেয়েদের সত্তর শতাংশ মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় সাবালিকা হওয়ার আগেই, তাদের মধ্যে যারা সাধারণ তারা স্বামী-সংসার নিয়ে, গালিগালাজ, মারামারি, অত্যাচার সয়ে বেশ থাকে ! ভাল থাকে না, কিন্তু মোটামুটি বেঁচে থাকে ! তারা লেখাপড়া নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না, সাধারণ সাংসারিক সুখটুকু যদি পায় তাহলে তো স্বর্গ হাতে পেল ! আর যদি না পায়, তাহলেও করার কি আছে, ভবিতব্য বলে মেনে নিতেই হয় ! বাকি ত্রিশ শতাংশের মধ্যে তিন ভাগের দু-ভাগ শরীর পুষ্ট হওয়ার আগে, যৌবন-এর চাওয়া জাগার আগেই মা হয়ে যায় ! তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ধার কে ধারে ? বাকি যে একভাগ মেয়ে থেকে গেল এই দুদলের বাইরে, তাদের জন্য অপেক্ষা করে জীবন সংগ্রাম ! লেখাপড়া করা, জীবনের স্বাদ পাওয়া, বাঁচার মত বাঁচার ইচ্ছা তাদেরকে মরিয়া করে তোলে, তখন-ই বিদ্রোহ, তখন-ই লড়াই ! সেই লড়াইতে কেউ কেউ হেরে যায়, কোথায় তলিয়ে যায় সংসার সাগরে, অথবা প্রলোভনের ভুল রাস্তায় চোরাবালিতে ডুবে যায় তাদের জীবন, চাওয়া-পাওয়া সব ! প্রাপ্তির আনন্দহীন এক গভীর নিরানন্দে ডুবে যায় তাদের জীবন ! কিন্তু যারা জিতে যায় সেই লড়াইতে তাদের সুখের অন্ত থাকে না ! জাগতিক বস্তু তাদের চাওয়ার বিষয় নয়, যেন একটা অপার্থিব আনন্দের খোঁজ সারাজীবন ! কুর্নিশ এইসব লড়াকু মেয়েদের ! সমাজ বা জীবন কিছুই এমনি এমনি হাতে জুগিয়ে দেয় না তাদের, তারা সেসব অর্জন করে আপন যোগ্যতায় !

সারাদিন এই এক চিন্তা পেয়ে বসেছে আব্দুল চাচাকে, মেয়ের লেখাপড়া শেখার ইচ্ছাটা সে পূরণ করবেই ! কিন্তু সে যে সুকঠিন কাজ ! তাদের সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া মানে ওই মক্তব-মাদ্রাসা । আলেফ-বে-তে টুকু শিখে কোরান কিছুটা পড়তে পারলেই অনেক ! তার বেশি পড়েই বা কি হবে ? গোটাকয় বাচ্চা নিয়ে নিজের জীবন-ই ঠিকমত টেনে নিয়ে যাওয়া কঠিন, অত্যন্ত ধকলের কাজ, আবার লেখাপড়া ? তা ছাড়া তাদের আত্মীয়স্বজন, সমাজ মনে করে বেশি লেখাপড়া জানা মেয়েরা বারমুখো হয়ে যায়, সংসারে মন থাকে না, পরিবারের নিয়ম মানে না, স্বামীর বাধ্য থাকে না ! এই সেদিন রাস্তায় মৌলবি সাহেবের সঙ্গে দেখা, আব্দুল – 'আস্সালামে ওয়াআলেকুম' – বলতেই বলেন – 'ওয়ালেকুম সালাম, কিরে মেয়ে ভাল আছে তো শ্বশুর বাড়িতে ? মাথা ঠান্ডা করে থাকে যেন ! অত বড়লোক পরিবার, একটা মানের জায়গা । তাদের মন জুগিয়ে চলা দরকার'। আব্দুল কি বলবে, চুপ করেই থাকে ! মৌলবীসাব আবার বলেন – 'ভালো করেছিস, পড়া ছাড়িয়ে বিয়ে দিয়ে । বেশি লেখাপড়া করলে মেয়েরা মাথায় উঠে যায়, সংসার উচ্ছন্নে যায় ! আমিনাকে বলবি ভাল হয়ে থাকতে, পড়া নিয়ে অশান্তি করা ভালো কথা নয় মোটেই' । আব্দুল একটু অবাক হয়, সেতো কিছু বলেনি, তাহলে উনি জানলেন কি করে যে আমিনার পড়ার জন্য ওদের সংসারে অশান্তি হচ্ছে ? নাকি এমনি উপদেশ হিসাবে বলছেন ? তাই হবে, আমিনার লেখাপড়ার শখ তো সকলেই জানে । এই গ্রামে শুধু নয়, আসে-পাশের দু-দশটা গ্রামে সকলেই আমিনার লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করে ! হিন্দুদের বেশিরভাগ বাড়িতে প্রশংসা করা হয়, নিজেদের মেয়েদেরকেও আমিনার মত হতে বলে । কিন্তু মুসলমান পরিবারগুলোয় খুব নিন্দা আমিনার ! সেই জন্যই মৌলবী সাহেব বুঝি কথাটা বললেন ! কথা শেষ করে মৌলবি সাহেব এগিয়ে যান । তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে আব্দুল । মন থেকে সংশয় যায় না । আমিনার শ্বশুর-এর সঙ্গে বড় যে দহরম-মহরম মৌলবী সাহেবের ! এরা জোট বেঁধে তলে তলে কোনো মতলব আঁটছে কিনা মেয়েটার পড়া বন্ধ করার জন্য, সেই সংশয়-ও উঁকি দেয় মনে ! তবে সহজে ছেড়ে দেবে না আব্দুল-ও যতটা দরকার লড়াই করবে। চেষ্টা করব মেয়েটার ইচ্ছা পূরণ করার ! কিছু অন্যায্য চাওয়া তো নয়, কেবল একটু পড়তে চাওয়া ! কিন্তু সেটা যে কত বড় ব্যাপার বোঝে না, বোঝার ক্ষমতাও নেই আব্দুল চাচার ! মেয়েদের পড়তে দিলেই তাদের গলায় জোর বাড়বে । চাওয়া শুরু হবে, তারা এগোতে চাইবে, তখন দমিয়ে রাখা কঠিন হবে – তাই আগে থেকেই সাবধান হও! 'রোগ হবার আগেই সারাও'! বিয়ে নামক টিকা দিয়ে দাও যাতে রোগ হতেই না পারে ! এই চলেছে যুগ যুগ ধরে, মেয়ে মানুষকে অর্ধেক মানুষ হয়ে বাঁচতে হয় । হ্যাঁ, এখন-ও একশতে সত্তর জন এই ধারণার শিকার হয় । কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, হতাশ মাথা নেড়ে, নিজের কাজে যায় আব্দুল । আজকাল চাষবাসেও মন নেই তার, খালি আমিনার চিন্তা । অবশ্য ছেলেরা উপযুক্ত হয়েছে তারাই করে নেয় বেশি কাজ ! ভাবে বাবার বয়স হয়েছে, পেরে ওঠেনা । বাবার শরীরের কথা জানে, ভাবে, মনের খবর কেউ রাখে না!

এইসব কথা কিন্তু আমাকে আব্দুল চাচাই বলেছে। কখনো তার বাড়ির দাওয়ায় বসে, কখনো বারুই পুর স্টেশন-এর চায়ের দোকানে বসে, আবার কখনো বারুইপুরটা আমাকে ঘুরিয়ে দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে ! কোনো ধারা ধরে বলেনি, যখন যেমন মনে এসেছে, বলেছে। আমি পরে সাজিয়ে নিয়েছি। আজ বেশ ভার হয়ে গেল মনটা আমার দেশের মেয়েদের কথা ভেবে। আর লেখা আসবে না।

আমি আজকাল প্রায় রোজ আসি আব্দুল চাচার বাড়ি। শুনি তার গল্প, তার জীবন, তার লড়াই-এর কাহিনী। নেশা ধরে যাচ্ছে আমার, ক্রমেই গল্পের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি ! যেন আমি কেন্দ্রীয় চরিত্র, আমাকে ঘিরেই গল্পটা আবর্তিত হচ্ছে। যত শুনছি আব্দুল চাচা আর আমিনার লড়াই-এর গল্প, তত মুগ্ধ হচ্ছি ! সত্যি বলতে কি আমরা, শহর বাসীরা এইসব প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক মানুষদের লড়াই-এর কিচ্ছু জানি না, বুঝি-ই না ! সম্ভব-ও নয় আমাদের পক্ষে বোঝা, ডাঙায় বসে কি জলের মাছের জীবন বোঝা সম্ভব ? যখন বেড়াজাল ঘিরে ধরে তাদের, তখন তাদের আশঙ্কা, ছটফটানির কতটুকু বোঝা যায় ? গ্রামের এই মানুষগুলোকে যখন, পঞ্চায়েত, গ্রামসভা, পুলিশ সকলে মিলে ঘিরে ধরে, তখন ফাঁস থেকে বেরোনোর জন্য তাদের আকুলি-বিকুলি আমরা কি করে বুঝব ? শহরে কি সমস্যা নাই ? আছে, কিন্তু সেসব সমস্যার ধরণ আলাদা ! যেমন-ই হোক, জীবন যুদ্ধ সকলের-ই থাকে, আছে। কিন্তু সব যুদ্ধ এক রকম নয়। শহরে বাড়ির চার দেওয়ালের বাইরেই ওৎ পেতে থাকে একটা টেনশন, দুশ্চিন্তার জগৎ। যে মানুষগুলো সকালে সাজগোজ করে অফিস-স্কুল-কলেজ-ও আরো নানা কাজে বাড়ির বাইরে গেল হাসিমুখে, তারা যে তেমনিভাবেই ফিরবে, সেই গ্যারান্টি আছে কি ? কত রকম বিপদ চারদিকে ! জলজ্যান্ত মানুষ বাইরে গেল, আর হয়ত ফিরেই এলো না ! পথে-ঘাটে ঘটে কত রকম দুর্ঘটনা, সব খবর আমরা জানতেও পারিনা। তাছাড়া দিন আনি দিন খাই লোকের তো আরো নানাবিধ সমস্যা ! বেঁচে থাকা, রোজকার খাবার যোগাড় করাই তো কঠিন কাজ ! সেগুলো আমি বুঝি, জানি। তুলনা হয় না দুটো জীবনের ! গ্রামের আব্দুলচাচার মত মানুষ, যাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো অসুবিধা নাই, রোজকার পেটের ভাত যোগানো যার সমস্যা নয়। সম্পন্ন চাষী, ঘরে পর্যাপ্ত খাবার মজুদ, সম্বৎসরের চাল-ডাল তো বটেই, সারা বছরের শাক-সব্জিও নিজেদের ক্ষেতেই চাষ হয়। মাসে একদিন দূরের হাটে যায় মাসের তেল-নুন-মশলাপাতি যোগাড় করতে। আজকাল অবশ্য গ্রামেও অনেকে ছোট ছোট মুদিখানার দোকান দিয়েছে, সেখানে প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিস-ই পাওয়া যায়। আর কাপড়-চোপড় তো বছরে একবার-দুবার কিনলেই চলে ! সে শহরে যাওয়া হয় মাঝে মাঝে। বেশ বেড়ানো, আউটিং, পিকনিকের মেজাজ তৈরী হয়। বাড়ির মেয়েরাও বাচ্চাদের সাজিয়ে, নিজেরা সেজেগুজে তৈরী তখন ! বাড়ির পুরুষরাও ভাবে, “চলুক এরাও, যায় না তো কোথাও, সারাদিন ঘরবন্দী জীবন ! তবু আজকাল টিভি হয়েছে বলে একটু বাঁচোয়া, লোড শেডিং-এর বাধা সত্ত্বেও ভালোই সময় কাটে, নইলে তো সেই পরনিন্দা-পরচর্চা, থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়, মেয়ে মানুষ তো বন্ধ জলার মাছ, অল্প জলেই ধড়ফড়ানি, বৃহতের ছোঁয়া নাই, একঘেয়ে জীবন ” – এই যে কেনা-কাটার জন্য বাইরে যাওয়া সে এক দারুন ব্যাপার ! সকালে উঠে দু-একজন মেয়েমানুষ লেগে পড়ে বড় করে রান্না-বান্নার কাজে। কিছুটা খেয়ে যাওয়ার জন্য, কিছুটা সঙ্গে নেওয়ার জন্য। সারাদিন বাড়ির বাইরে, তা ছাড়া বাচ্চারা সঙ্গে, না খেয়ে পারা যাবে কি ? অতএব, সাতসকালে রান্নার ধুম। তবে সংক্ষেপ ব্যাপার। পেট ভরানোটাই আসল, খাওয়ার বিলাসীতা নয়, সেটা তো রোজ-ই থাকে ! একদিন নাহয় একটু অন্যরকম, সেটাও মজা ! আরেক প্রস্থ রান্না হয় সঙ্গে নেওয়ার জন্য। আগেরকার দিনে নেওয়া হত মুড়ি-চিঁড়ে, এখন নেওয়া হয় রুটি/পরোটা আর ক্ষেতের টাটকা বাঁধাকপি/ফুলকপির তরকারি, অথবা ক্ষেতের-ই নতুন আলু-মটরশুঁটির দম। কি যে স্বাদ সেসবের ! পোঁটলা বেঁধে রুটি তরকারি, আর শহর বাজারের মিষ্টি, আর কর্পোরেশনের বা টেপাকলের টাটকা মিষ্টি জল ! কত সামান্য জিনিস, কিন্তু কি অসামান্য সুখ ! এতো গেলো খাওয়া-দাওয়ার দিক। বাড়ির মহিলাদের আরেক দল লেগে পড়েছে বাড়ির বাচ্চাগুলোকে নিয়ে, স্নান করানো, খাওয়ানো, সাজানো – সোজা কাজ তো নয় ! শান্ত গুলোকে নিয়ে ঝামেলা কম, বেশ লক্ষ্মী হয়ে কথা শোনে, বেড়াতে যাওয়ার আনন্দে সাগ্রহে তৈরী হয়। বিপদ বাঁধে দস্যিগুলোকে নিয়ে ! সব পরিবারেই থাকে দু-চারটে, সাধা-সাধি, মারধর, কান্নাকাটি, সে এক ধুন্ধুমার কান্ড বেঁধে যায় ! যাই হোক অবশেষে সকলে রেডি হলে রওনা হবার সময় হয়। এখানেও আধুনিকতার ছোঁয়া, আগে যাওয়া হত গরুর গাড়ি বোঝাই করে, এখন

গ্রামের অবস্থাপন্ন ঘরে থাকে টাটা-র বড় গাড়ি সুমো। দুগ্গা দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড়ে সারাদিন কেনাকাটা, পিকনিক তারপর ফিরে আসা, সে একরকম নিশ্চিন্ত আনন্দের জীবন। খাওয়া-পরার অভাব না থাকলে, গ্রামের জীবন মোটামুটি শান্ত, টেনশন মুক্ত, নির্বিঘ্ন ! কিন্তু আব্দুল চাচা আর আমিনার মত যারা অন্যরকম মানুষ, যাদের চাওয়াটা একেবারেই আলাদা, তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকে সমস্যার পাহাড়। মনোবাসনা পূর্ণ করার পথে হাজার বাধা। আমার চাচা আর তার মেয়ের গল্প-ও সাধারণের ভাবনার বাইরে, অতি ছোট, অথচ বিশেষ চাওয়ার কথা। সে গল্পে লড়াইটা গ্রাম সভা, পঞ্চায়েত, জোতদার, পুলিশ সকলের সঙ্গে। চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, বাধা দেয়। দমবন্ধ হয়ে আসে, বেড়াজালে ফেঁসে যাওয়া মাছের মত জাল টপকে পালানোর ছটফটানি ! কেউ পারে, কেউ হারে। আব্দুলচাচা আর আমিনার সেই জাল টপকে পালানোর গল্প বলতে বসেছি আমি। জানিনা কতটা পারব। ওদের পরিস্থিতিতে না পড়লে, ওদের মত করে কি আর বোঝা যায় কি কঠিন সে যুদ্ধ ! আমি চেষ্টা করেছি বুঝতে, অনুভব করতে, আর বসেছি সে গল্প আর পাঁচজনকে শোনাতে। শুধু তো নিষ্ফল লড়াইয়ের গল্প নয়, এ যে 'আলোর পানে প্রাণের চলার'-র গল্প!

আজকাল প্রায় রোজ-ই তো আসি বারুইপুরে। গল্পের নেশায় পেয়ে বসেছে, তায় আবার জীবন্ত মানুষের জীবনের গল্প ! বাস স্ট্যান্ড-এ বাস থেকে নেমেই আগে খুঁজি আব্দুল চাচাকে। পেয়ে গেলে তো পোয়া বারো। না পেলেও অসুবিধা হয় না খুব, ঘন ঘন আসি বলে অন্য রিকশাওয়ালা ভাই-বন্ধুরাও চিনে গেছে। জেনে গেছে কোথায় যাব আমি। বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরোলেই ডাকাডাকি – 'আসেন দিদি, আমি নিয়া যাই' – আমিও নির্দ্বিধায় উঠে বসি। এখন আমি জেনে গেছি এরাও আমাদের মত মানুষ, একটু বেশি রকম মানুষ বোধ হয় ! শহরের অট্টালিকার মিথ্যা জীবন, আর তার মানুষ গুলোর থেকে বেশি খাঁটি ! চার তলার উপর থেকে পৃথিবীকে দেখা যে কত ভুল দেখা, সেটা খুব বুঝি আজকাল ! এই মানুষগুলো এত ভালো, আমার খুব আপন মনে হয় এদের ! খারাপ কি আর নেই ? আছে হয়ত, তবে আমার কপালটা ভাল, এখন-ও দেখা পাইনি তেমন কারো। আমি দেখেছি সাদাসিধা, সরল মানুষগুলোকে ! উঠে বসি রিকশায়। বলতে হয় না কোথায় যাব, ওরা সকলে জেনে গেছে আমি আব্দুল চাচার লেখিকা দিদি, মাঝে মাঝেই আব্দুল চাচার বাড়ি যাই। কত গল্প হয় আমার তাদের সঙ্গে! তারা রিকশায় প্যাডেল করে আর গল্প করে, নিজেদের সুখ-দুঃখের সাধারণ কথা, বৌ-এর শরীর খারাপ, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া, ভাই-এর চাকরি, বোনের বিয়ে, বাবার হাঁপানী, মায়ের বাত সে কতরকম গল্প ! লক্ষ্য করেছি এদের প্রায় সকলের-ই মা-বাপ-ভাই-বোনের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকে, আমাদের মত একাবোকা জীবন নয় ওদের ! ভাব-ঝগড়ার টাকনা দেওয়া বৈচিত্র্যের দারুণ জীবন ! সমস্যাও নানারকম – 'বোর' হওয়ার অবকাশ-ই হয় না। সেই জন্যই জীবন যুদ্ধে তাদের মরণপণ লড়াই ! আত্মহত্যার কথা ভাবে না তারা কথায় কথায় ! শহরের মানুষের সীমিত জীবন, ছেলে-মেয়েরা জন্ম থেকে না চাইতেই হাতে পেয়ে যায় চাওয়ার জিনিস প্রায় সব-ই ! বাবা-মা অন্য কোথাও, কারো জন্য কোনো ডিউটি, কর্তব্য করে না, কেবল নিজের সন্তানটিকে ঢেলে দিতে চায় সব সুখ, ঐশ্বর্য ! তারপর একদিন তাদের ক্ষমতা ফুরায়। সন্তান হঠাৎ শেখে যে পাওয়ার-ও শেষ আছে, একদিন থামতেই হয়। কিন্তু থামতে তারা শেখেনি, শেখেনি চাওয়াকে সীমায় বাঁধতে, হঠাৎ ধাক্কায় দুর্বল মনের ব্যালেন্স নষ্ট, তখন আত্মহত্যা, না হয় ডিপ্রেশন অথবা মানসিক রোগ ! এভাবেই সমাজের স্থৈর্য নষ্ট হয়, বিপদ ঘনায় ! নিঃশ্বাস ফেলে মনকে চিন্তা থেকে বের করে আনি, রিকশাওয়ালা ভাইদের গল্পে মন দি। তারা নিজেদের গল্প করে, আর বলে আমিনা আর আব্দুল চাচার কথা। নিন্দা নয়, তারিফ, বলে – 'আমাদের মত ছোট ঘরে অমন মেয়ে হয় না ম্যাডাম। লেখাপড়ায় এত ভালো, কিন্তু একটু দেমাক নেই, কি সুন্দর মন ! দেবী সরস্বতীর ভর আছে মনে হয়' ! তেমনি স্বভাব, কোনোদিন উঁচু গলায় কথা বলে না। একদিন-ও বিনা পয়সায় রিক্সা চড়বেনা, বলে কি জানেন ? যেদিন পয়সা থাকবে না চড়ব বৈকি ! কিন্তু এখন যখন আছে 'একটা পাগল মেয়ে' – বলেই হা হা করে হাসে তারা। আমি আবার নূতন করে ভালবাসি আমিনাকে। সেই সহজ-সরল-মেধাবী-বিনয়ী কিন্তু তেজী মেয়েটাকে কি ভাল না বেসে পারা যায় ? কেবল ভালবাসা নয়, শ্রদ্ধা-ও হয় সেই ভাল মানুষ মেয়েটার জন্য, শিক্ষার জন্য, বিদ্যার জন্য তার লড়াই সম্মানের দাবী রাখে ! ঐটুকু একটা মেয়ে, না কোন সম্বল, না সহায়, একা লড়ে যাচ্ছে। না, সহায় আছে বৈকি ! তার নিরক্ষর কৃষক পিতা ! কি বুঝেছে সেই মানুষটা কি জানি, কিন্তু সর্ব শক্তি নিয়ে মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়েছে। কোনভাবে তার মনে এই বিশ্বাস

জন্মেছে যে বিদ্যার জন্য তার মেয়ের লড়াইটা অতি বৃহৎ, অতীব মহৎ ! সেই উপলব্ধির জেরে নিজের এবং পরিবারের শত বিপদ উপেক্ষা করতে পেরেছে সে ! দেশ-ঘর-সমাজ সব ছেড়ে একজন সম্পন্ন কৃষক পরিণত হয়েছে রিক্সাওয়ালায় ! গ্রামের স্বচ্ছল, মোটামুটি নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে মধ্য বয়সে শহরে এসে, বেছে নিয়েছে ঝুঁকির জীবন ! এই বাপ-মেয়ে দুইজন-ই আমাদের সম্মান পাওয়ার যোগ্য আমি মনে করি। রিকশা চড়ে যেতে যেতে চালকের নানা গল্প শুনি আর নানা কথা ভাবি আপন মনে। আব্দুল চাচার বাড়ি পৌঁছে যাত্রা শেষ হয়। গেটে ঠক ঠক করতেই ফোকলা দাঁতের একমুখ হাসি নিয়ে, বেরিয়ে আসে আমার চাচী। হাসিমুখে সাদরে ভিতরে ডেকে নেয় আমায়। আমাদের পুনর্মিলনের মিষ্টি ছবি দেখে, আমার রিকশাওয়ালা ভাই হাসতে হাসতে তার গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যায়। আমি আর চাচী গল্পে মেতে উঠি। সরল, সাধারণ জীবন তাদের, জীবনযাত্রার ঘটা কিছু নাই, তাই কাজকর্ম কম। আর চাচী আমার সুদক্ষ গৃহিনী, আমি পৌঁছনোর আগেই তার ঘরের সব কাজ, মায় স্নান অব্দি সারা হয়ে গেছে। সকালে বেরোনোর আগে আমিনাও মায়ের হাতে হাতে অনেকটা কাজ গুছিয়ে দিয়ে যায়, কাজেই এখন চাচীর একটু বিশ্রাম। চাচা দুপুরে ফিরবে, স্নান-খাওয়া সারবে, ততক্ষণ আমাদের গল্পের অবসর ! স্টোভ জ্বেলে চা করে চাচী, আমি তার পাতা মাদুরে বসি তাদের দাওয়ায়, চার পাশে বড়-ছোট গাছের নীচে চাচার ছোট্ট বাড়িখানা আমার ঠিক তপোবনের মত মনে হয় ! যেখানে তপস্যা মগ্ন এক তাপসী। সেই তপস্যায় সহায় তার নিজের মনোবল আর তার বৃদ্ধ পিতা ! সেই শান্ত দুপুরে, গাছের ঠান্ডা হাওয়া, পাতার আড়ালে আর লুকোনো পাখির ডাক আমাকে স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়, যেখানে প্রত্যেকটা মেয়ে লেখাপড়া শিখবে, কোন পরিবার, কোন সমাজ, কোন ধর্ম তাদের বিদ্যালাভের বাধা হবে না ! আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ, কেমন দেশ, কেমন সমাজ যেখানে ধন-সম্পদ নয়, বিদ্যা লাভের জন্য লড়তে হয় একটা অসহায় মেয়েকে, তার পরিবারকে ? স্বাধীনতার এত বছর পরও মেয়েদের জন্য বিদ্যার খোলা আকাশটুকু দেওয়া যায় না ! সাত-পাঁচ ভাবি আর মন খারাপ হয়। চাচীর ডাকে সম্বিৎ ফেরে, দেখি চাচী এনেছে গরম চা আর চালভাজা। নিঃশ্বাস ফেলে বাস্তবে ফিরি। হায়রে, কোনদিন দেখব কি সেইসব স্বপ্নের দিন ? বয়স হয়ে যাচ্ছে, দূরদূরান্তে এখনও সে ছবির প্রকাশ দেখিনা, কি জানি আরো কত দিন-মাস-বছর-যুগ বাংলার ঘরে ঘরে আমিনাদের লড়তে হবে, কেবল বিদ্যার অধিকারের জন্য ! এইসব কথা ভাবি নিজের মনেই, চাচী আমার সাদাসিধা, বিনা ঘোর প্যাঁচের মানুষ, এত শক্ত কথা সে বোঝে না, সে তার স্বামী-মেয়ের লড়াইয়ে সামিল স্বাভাবিক আনুগত্যে, আর সন্তান স্নেহে ! বুঝেই বা করবে কি সে ? আমরাই কিছু করতে পারিনা ! স্বাধীনতার এত বছর পরেও কেন সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না ? এত যে সর্বশিক্ষা অভিযান, কন্যাশ্রী প্রকল্প, হ্যানা-ত্যানা, তার সুফল সকলে পাচ্ছে কিনা, সেটা কে দেখবে ? বিচ্ছিন্নভাবে ভেবে আমরা কতটা কি করতে পারব ? আমরা যারা সমস্যার আসল শিকড়টা খুঁজে পাইনা, তারাও তো ওদের মতই অসহায়, কোনো সাহায্য করার ক্ষমতা নেই ! হতাশ হয়ে, নিষ্ফল সব ভাবনা সরিয়ে রেখে চা-চালভাজায় মন দি। মনের ভিতর কথার বাষ্প উঠতেই থাকে, কিন্তু এক জোট না হলে, কোন বিস্ফোরণ ঘটানো যায় না। একজোট কি আমরা কোনোদিন হতে পারব ?

(চলবে)

মমতা দাস (ভট্টাচার্য) – স্বাধীনতার কিছু পরে ওপার বাংলার (তখন পাকিস্তান) সিলেট জেলায় জন্ম। তিন বছর বয়সে শিকড় উপড়ে এপার বাংলায়। জীবনের প্রয়োজনে দেশের নানাপ্রান্তে, বিদেশেও প্রবাসী জীবন। দীর্ঘপ্রবাসের পর কলকাতায় ফেরা। যৌবনের ছেড়ে যাওয়া শহরটা বদলে গেছে। মন খারাপ। তবু লিখে যাওয়া। তিনটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের পর দুটি কাব্য গ্রন্থ। ইতিমধ্যে মুম্বাই, ডুয়ার্স এবং কলকাতার বিভিন্ন কাব্য সংকলনে অন্য কবিদের পাশে স্থান পাওয়া। বাংলাদেশ থেকেও সংকলনে কবিতার স্থান লাভ। সতত নিরত সাহিত্য চর্চায়। পেশা নয়, নেশা।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

যুদ্ধ শেষ – পাকিস্তানের মাটিতে ছয়মাস – মেরাজকে থেকে সংরুর

পর্ব ৭

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাতই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ সপ্তম পর্ব।

প্রায় প্রত্যেক দিনই একটা করে চিঠি লিখতাম। বাবা-মাকে, ছোটদা, দাদা-বৌদিকে, দিদিদের এবং অবশ্যই দেবুকে। লিখতাম পাল্টে পাল্টে। ওই সময় আমরা ফ্রি ফোর্সেস লেটার পেতাম। বিনা পয়সায় চিঠি চলে যেত। একজনের সপ্তাহে দুখানা চিঠি পাওয়ার কথা, মানে মাসে আটটা চিঠি। আমার তো আটটা চিঠিতে হত না। এমন অনেক ছিল যারা চিঠিপত্র কম লিখত। তাদের খামটা আমি নিয়ে নিতাম। আমার কাজটা চলে যেত। তখনো আমার বিয়ে হয়নি, বিয়ে হলে চিঠির সংখ্যা আরো বেশি হত হয়ত। আমরা চিঠি পাঠালে সেটা বিনা পয়সায় তো হতই, আমাকে যারা চিঠি লিখতো তারা যদি বিনা স্ট্যাম্পের সাদা খামে ঠিকানা লিখে উপরে অন অ্যাক্টিভ সার্ভিস লিখে ওইটা আন্ডারলাইন করে দিত – তাহলে চিঠি বিনা পয়সায় চলেও আসতো। চিঠি আসা যাওয়াতে কোন পয়সা লাগতই না। এত বছর পরও দু-একটা ফোর্সেস লেটার বাড়িতে রাখা আছে, পুরোনো স্মৃতি রক্ষার জন্য।

আর একটা বাজে কাজ করেছিলাম। পরে ছুটিতে যাওয়ার সময় ৫-০-ব্রাউনিং, যা কিনা ট্যাংকে ব্যবহার করা হয় আন্টি এয়ারক্রাফট এর জন্য – তার কয়েকটা লাইভ রাউন্ড এবং ৭.৬২ রাইফেল এর কয়েকটা লাইভ রাউন্ড নিয়ে বাড়িতে গিয়ে রেখেছিলাম। সকলকে দেখানোর জন্য। সকলকে দেখিয়েও ছিলাম। ছুটি কেটে চলে আসার সময় নেদাকে দেখিয়ে এসেছিলাম এইখানে রইল বলে। ছুটির শেষে ইউনিটে গিয়ে মনে হল কাজটা একেবারে ঠিক হয়নি। নেদাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম ওই রাউন্ড গুলো যেন অবশ্যই কোন পুকুরে গোপনে ফেলে দিয়ে আসে। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম ওগুলো ও সব পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। বাড়িতে এখনো রাইফেল, স্টেন ও পিস্তলের ব্যবহার করা রাউন্ড বোধহয় খুঁজলে পাওয়া যাবে। তামার অংশ যেটা কিনা টার্গেটে গিয়ে লাগে।

সিজ ফায়ারের পর পাকিস্তানে যে গ্রামে আমরা ছিলাম প্রায় ছয় মাস, তার নাম মেহরাজকে। নামটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা বলে। কানু কিন্তু নামটা মনে রেখেছিল, জিজ্ঞাসা করতে আমাকে জানাল। না হলে গ্রামের নামটা আর লেখা হত না।

এই ভাবেই কাটছিল আমাদের। বড় বেশি বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে বারবার, কিন্তু এখন তো এই অবস্থায় ছুটি পাওয়া যাবে না। ছুটি খুলে গেলে আগে আমি চেষ্টা করব বাড়ি যাবার। এতদিন একরকম কাটছিল, এবার অফিসাররা ঠিক করলেন ফৌজীদের এইভাবে বসিয়ে রাখা ঠিক হবে না। ফিটনেস নষ্ট হয়ে যাবে। ফৌজীদের অলস ভাবে থাকলে চলেনা। ঠিক হলো সকালে ৪০-৪৫ মিনিট ফ্রিহ্যান্ড ব্যায়াম করতে হবে। শুরু হলো সকালে পিটি। মাঝে একটু দৌড়াতেও হত। আমাদেরও ভালো লাগছিল। পিটি শেষ হলে এক ঘন্টা পর যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হত। এই একঘন্টা ব্রেকে টিফিন খেয়ে নিতে হত। মিলিটারিতে সকালের টিফিন মানে লুচি তরকারি কিংবা লুচি ডাল। সাথে চা তো থাকতোই। চারটে করে বড় লুচি দিত। অনেক সময় ওই চারটে লুচিতে পেট ভরত না। খিদে পেয়ে যেত। অপেক্ষা করতাম কখন দশটা সাড়ে দশটা

বাজবে। ওই সময় আবার চা আর পকোড়া পাওয়া যাবে। দুপুর ১ টায় আবার ভাত, রুটি, তরকারি, ডাল ইত্যাদি। কেউ যদি পুরো ভাত খেতে চায় কোন অসুবিধা নেই কিংবা কেউ যদি পুরো রুটি খেতে চায় খেতে পারে। সপ্তাহে তিন দিন রাত্রে মাংস দিত। পাকিস্তানের মাটিতে বসেও আমরা ফ্রেশ মাংস খেতাম। কোথা থেকে আনত জানি না। যদি কোনো কারণে মাংস না থাকত, তাহলে প্রতিজনের মাথাপিছু সোমবার চারটে করে ডিম পাওয়া যেত। বুধবার আরো চারটে আর শনিবার ৬টা ডিম পাওয়া যেত। হিসেবটা হচ্ছে, প্রত্যেকদিন মাথাপিছু ১০০ গ্রাম মাংস পাওয়ার কথা, যেটা সোমবারে ২০০, বুধবারে ২০০ আর শনিবারে ৩০০ গ্রাম মাংস দিয়ে পূরণ করা হত। ১০০ গ্রাম মাংসের জন্য বিকল্প ছিল দুটো ডিম। সেই কারণে মাংস না পাওয়া গেলে, সোমবার চারটে, বুধবার চারটে আর শনিবার ছটা ডিম হিসাব করে দিত – সপ্তাহে মোট ৭০০ মাংস বা ২৪ টা ডিম। যারা মাংস খেতো না তাদের জন্য দুধ ও ফল দেওয়া হত। এত কিছুর মধ্যেও আমাদের মাছ ধরা কিন্তু চালু ছিল। মাঝে মাঝে দুপুরের মাছ ভাতও হত। অপেক্ষা করছি কবে ছুটি চালু হবে। এই বছরের পুরো অ্যানুয়াল লিভ আমার পাওনা আছে। দু মাসের ছুটি পাওয়ার কথা। তিরিশ দিন ক্যাজুয়াল লিভ যে এবছর পাওয়া আর যাবেনা সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কতদিন এই অবস্থায় থাকতে হবে বোঝা যাচ্ছে না। আর ভালো লাগছে না, বাড়ি যেতে চাই।

যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের পর কিছু ঘটনা মনে পড়ে গেল। কাপুরথালায় যখন ছিলাম ঠিক যুদ্ধের আগে, সেই সময়ে এ স্কোয়াড্রন কমান্ডার ছিলেন মেজর M.A.R শেখ। হায়দ্রাবাদে বাড়ি ছিল। সুপুরুষ চেহারা। খুব ফর্সা এবং বেশ ভালো লম্বা ছিলেন। ঠিক যুদ্ধের আগে শুনলাম শেখ সাহেবের কোথায় যেন পোস্টিং হয়ে গেছে। স্কোয়াড্রনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেজর রবীন্দ্রনকে। রবীন্দ্রন সাহেব এর আগে এডজাঙ্কট হিসেবে ছিলেন সিক্সটিন ক্যাভেলরীতে। যুদ্ধের আগে কেন শেখ সাহেবকে পোস্টিং করা হয়েছিল অন্য জায়গায় জানিনা, এটা একটা রহস্য হিসেবেই রয়ে গেল।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল, যদিও এই যুদ্ধের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, অনেক পরের ঘটনা। তবুও মনে হয় কোন একটা ব্যাপার আছে। আমি তখন EST-২২ তে পোস্টিং নিয়ে যাচ্ছি। দেরাদুন ট্রানজিট ক্যাম্প এ আছি। কয়েকজন একসাথে হলে ইএসটি টুয়েন্টি টু হেডকোয়ার্টার্স চক্রতা-তে পাঠাবে। দেখলাম 'ওহাব' বলে একজন ইলেভেন কর্পস সিগন্যাল রেজিমেন্ট – জলন্ধর থেকে এসেছে। একই জায়গায় মানে চক্রতা-তেই যাবে। দেরাদুন থেকে চক্রতা সম্ভবত ৭-৮ ঘন্টা লাগবে। রাস্তা অত্যন্ত খারাপ ছিল। সেই সময় ওয়ান ওয়ে গেট সিস্টেম ছিল। যাইহোক, সন্ধ্যের আগে আমরা সকলে চক্রতায় পৌঁছালাম। ওই দিন রাত্রে 'Meat day' হওয়ার জন্য মেসে মাংস ছিল। ওখানে বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে, পাহাড়ি এলাকা বলে। আমি তো রুটি মাংস নিয়ে খেয়ে ব্যারাকে চলে এলাম। ওহাব মেসে গিয়ে বলে আমি এই মাংস খাব না, আমাকে ডিম দেওয়া হোক। এই কথার জন্য রাতারাতি জল অনেক দূর গড়িয়ে গেল, আমরা কিছুই জানতাম না। পরদিন সকালে জানতে পারলাম ইএসটি টুয়েন্টি টু-তে কোনো মুসলমান ছেলের পোস্টিং করা যাবে না। পরে জানতে পারি ইলেভেন কর্পস সিগন্যাল রেজিমেন্টকে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছিল ওখানে ওহাবের পোস্টিং করার জন্য। এও একটা রহস্য।

আরো একজনের কথা মনে পড়ছে। তখন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। আমরা প্রত্যেক দিনই একসাথে ট্যাঙ্ক হারবারে যাচ্ছিলাম, একই জিপে যাতায়াত করছিলাম। সব থেকে মজার ব্যাপার ছিল কাপুরথালায় আমরা সকলে একসঙ্গে ছিলাম। আজ এতদিন পর আর তার নাম মনে নেই – সম্ভবত কেরালার মুসলমান ছেলে ছিল সে। যুদ্ধের সময়, হারবারে যাওয়ার সময়, একদিন হঠাৎ সেই ছেলেটির আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। রাতের অন্ধকারে আমাদের গাড়ি অনেক জায়গায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়। রাস্তার অসুবিধার জন্য। রাতের অন্ধকারে আমাদের সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কখন যে সেই ছেলেটি গাড়ি থেকে নেমে কিভাবে কোথায় চলে গেল সেটা আজও আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেছে। পরে সকলেই বলেছে সে ইচ্ছে করেই ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে গেছে। কিন্তু এতদিন ভারতে আমরা একসাথে চাকরি করছিলাম, একই ব্যারাকে ঘুমোতাম একই মেসে খেতাম। আজও আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে ওই ছেলেটির কোনো হদিস না মেলার, হারিয়ে যাওয়ার।

এখন যুদ্ধের রেশটা কেটে যাওয়ায় কিছু কিছু ছেলেকে ছুটিতে পাঠাচ্ছে, আমিও চেষ্টা করছিলাম যাতে আমাকে ছুটিতে পাঠায়। কিন্তু এই সময়ে আমার যাওয়া হল না। হঠাৎ খবর পেলাম কানু কুড়ি দিনের পার্ট অফ অ্যানুয়াল লিভে যাচ্ছে। আমার কাছে সামান্য কটা টাকা ছিল, ওই টাকাটা কানুর হাতে পাঠিয়ে দিলাম, সেটা বাড়িতে দিয়ে দেওয়ার জন্য। আর ওকে ভালভাবে বলে দিয়েছিলাম, ও যেন কোনো মতেই বাবাকে না বলে আমরা ঠিক কোন জায়গায় আছি। ছোটদাকে বা নেদাকে বললে কোন অসুবিধা নেই। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের নানা জায়গায় বড় বড় দোকান লুট হতে দেখেছি। কোন এক্সট্রা জিনিস নেবার ইচ্ছে হতো না। তবে সিভিলিয়ানরা সব সময় গরুর গাড়ি বা মহিষের গাড়িতে লুট করে নিয়ে চলে গেছে নিজেদের জায়গায়। আর কোন গ্রাম বা শহরের নাম মনে না থাকলেও মেহরাজকে চিরকাল মনে থেকে যাবে। মেহরাজকে স্মৃতির একটা অংশ।

সকালে পিটি করা, তারপর টিফিন, সব ট্যাঙ্কে একবার করে চক্কর মারা – কোন কাজ আছে কিনা দেখা। তারপর দশটার সময় চা-পকোড়া খেয়ে কোন গাছ তলায় বসে গল্প করা – এই ছিল আমাদের কাজ। কোনরকমে সময় কাটিয়ে বেলা একটা বাজাতে হবে, তারপর দুপুরের খাওয়া, তারপর লম্বা বিশ্রাম। এর মাঝে আবার আখ খাওয়া। প্রতিদিন আখ খেতে আর ভালো লাগেনা এখন। এই ভাবেই চলছিল আমাদের প্রতিদিনের জীবন।

এবার হঠাৎ শোনা যাচ্ছে আমাদের ফিরতে হবে। পাকিস্তানের সব জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমরা ফিরে যাব ভারতে। তবে কোথায় যাব এখনো জানি না। আমরা যেমন শিয়ালকোট এরিয়ায় আটত্রিশ কিলোমিটার কব্জা করেছিলাম, পাকিস্তানও কিন্তু রাজস্থানের সেক্টরে কিছু অংশ কব্জা করে নিয়েছিল আমাদের। সেসব জায়গা ওরাও ছেড়ে দেবে। এটাই যুদ্ধের নিয়ম। একসময় সত্যি সত্যি আমরা হুকুম পেলাম ফিরে আসার। ইতিমধ্যে প্রায় ছ'মাস হয়ে গেছে ওই জায়গায়। যুদ্ধের পর cease fire হবার ছ'মাস পর আমরা একে একে মেহরাজকে-কে বিদায় জানিয়ে আস্তে আস্তে ফিরতে লাগলাম। আমাদের কিছু লোক এডভান্স পার্টি হিসাবে কাপুরথালায় চলে গেল। আমরা শুনতে পাচ্ছি পাঞ্জাবের 'সংরুর' বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে যেতে হবে। সংরুর আমাদের নতুন ঠিকানা হবে। যুদ্ধ শেষ করে ভারতের মাটিতে ফিরে যাচ্ছি এবং জীবিত অবস্থায় আছি, এইটাই একটা আনন্দের ব্যাপার। বেঁচে আছি, আবার বাবা-মা সব আত্মীয়দের সাথে দেখা হবে, এটা ভেবে আনন্দ হচ্ছে। নতুন জায়গায় পৌঁছে ছুটি পাওয়া যাবে শুনছি, কিন্তু কবে সংরুর পৌঁছাব জানি না। অনেক ধাক্কা খেতে খেতে যেতে হবে। যুদ্ধের সময় যেমন সব সময় মনে হতো এখনো বেঁচে আছি, একঘন্টা পরে বেঁচে থাকব তো? ফেরার সময় আবার যুদ্ধ জয়ের আনন্দ, বেঁচে ফেরার আনন্দ, বাড়ির সকলের সাথে দেখা হবার আনন্দ, আরো কত কি চিন্তা করতাম – আজ আর পুরোটা মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে মনটা সবসময় আনন্দে থাকত।

এইভাবে ধাক্কা খেতে খেতে একসময় সত্যি সত্যি সংরুর পৌঁছে গেলাম। নতুন জায়গায় অনেক কাজ থাকে। খাটনি বেড়ে যায়। আমরা এখানে আমাদের নতুন সংসার গোছাতে লাগলাম। ধীরে ধীরে কাপুরথলা থেকে এডভান্স পার্টি ওখানকার সব মালপত্র নিয়ে সংরুরে পৌঁছাতে লাগলো। কয়েকদিনের মধ্যে সিগন্যাল সেকশনের সমস্ত স্টোর আমরা হাতে পেলাম। আর আমাদের নিজস্ব জিনিস মানে প্রত্যেকের নিজস্ব সিভিল জামাকাপড়, বিছানাপত্র, আমাদের নিজের নিজের বাক্স পৌঁছে গেল। সেগুলো খুলে রোদে দিলাম। আবার আমরা শোয়ার সময় চারপাই মানে দড়ির খাটিয়াতে শুতে পাব। আবার আমরা বিছানার উপর কম্বল চাদর পেতে ঘুমাবো। মশারি লাগানোর ব্যবস্থা হল। এখন আমরা পুরনো জীবনে ফিরে এলাম। এত দিন যখন বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পেতাম, তখন তো মাটিতে হেলমেট মাথায় দিয়ে বিশ্রাম নিতাম। এবার মাথায় বালিশ থাকবে। আমাদের জন্য যে ঘর দেওয়া হয়েছে সেটা ভালোভাবে সাজিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। অপেক্ষায় আছি কখন ছুটি দেওয়া শুরু হবে, আমরা বাড়ি যাবার সুযোগ পাবো। আর বাবা মার, বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা হবে।

এটাই ছিল ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের বিবরণ। অনেক কিছু মনে নেই, যতটা পেরেছি লিখলাম। তবে এটুকু বলতে পারি এই যুদ্ধে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কয়েক লাখ টাকা দিয়ে কেনা যাবে না। এটা জীবনের একটা বড় সম্পদ। অনেকে মিলিটারিতে ভর্তি হয়ে, বেশ কিছু বছর চাকরি করে বাড়ি চলে যায় কিন্তু যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। আমি

ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি যে ১৯৬২ সালে ভর্তি হয়ে ১৯৬৫ সালের মধ্যে এত বড় একটা যুদ্ধের অংশীদার হতে পেরেছিলাম। এই অভিজ্ঞতার জন্য নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান বলে মনে হয়।

এটাও একটা যুদ্ধের অংশ। লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। এবং এটাও বলে রাখি, যেটা লিখতে যাচ্ছি সেই ঘটনাটা আমার চোখের সামনে ঘটেনি। আমি শুনেছিলাম সেই মেহরাজকে গ্রামে। ট্যাঙ্কের পাশে বসে ছিলাম, সেই সময় ক্যাপ্টেন বি এম কাপুর – আমাদের সিগন্যাল অফিসার ছিলেন – তাঁর মুখে। তিনি বললেন, লাহোর সেক্টরে ভারতীয় সেনার একটা বড় সাফল্যের খবর পেয়েছেন। বললেন, কয়েকদিন আগে লাহোর সেক্টরে ইছাগীল খালের কাছাকাছি নাইট হারবার করেছিল পাকিস্তান বাহিনী। যেমন আমাদেরও নাইট হারবার করতে হয়। এটা যুদ্ধের একটা অঙ্গ। পাকিস্তান বাহিনী নাইট হারাবার করার পর তাদের দৈনন্দিন কাজ করতে ব্যস্ত। সেই সময় আমাদের রেকি troop ওদের লোকেশনটা দেখে চলে আসে। অফিসারদের মধ্যে আলোচনা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক চলে যায় ওই লোকেশনে। প্রথম রাত্রে সেনারা সাধারণভাবে ট্যাঙ্কের ইলেকট্রিকাল, মেকানিকাল, মেনটেনেন্স, পেট্রোল ভরা, রিপেয়ার করা – যদি প্রয়োজন হয়, রাতের খাবার খাওয়া এবং পরের দিনের সকালের টিফিন ও দুপুরের খাবার মেস থেকে নেওয়া এইসব কাজে ব্যস্ত থাকে। এসব করতে করতে রাত তিনটে-সাড়ে তিনটে বেজে যায়। তারপর ওই ট্যাঙ্কের ওপর ঘণ্টাদুয়েক বিশ্রাম নিয়ে আবার পরের দিন সকালে শুরু হয় গোলাগুলি চালানো, জায়গা দখল করা, আবার প্রয়োজনে খানিকটা পিছিয়ে আসা। ভারতীয় সেনার লোকেরা তিনটের পর ওই ইছাগীল খাল কেটে দেয় দু তিন জায়গায়। প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকে যায় ওই এরিয়াতে। যা কিছু ঘটেছে সব অন্ধকারে এবং নিঃশব্দে। ওরা কিন্তু জল ঢোকার ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। প্রায় এক ঘন্টা পর ভারতীয় বাহিনীর তরফ থেকে হারবার লক্ষ্য করে এলএমজি বা লাইট মেশিনগান ফায়ারিং করলে তাতে ওরা সতর্ক হয় এবং ট্যাঙ্কগুলোকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু যত নড়াচড়া করতে থাকে ততই ওই নরম মাটিতে ট্যাঙ্ক ফেঁসে যায় এবং নড়াচড়াতে ট্রাঙ্কের ট্র্যাকের জন্য মাটি খুঁড়ে যায়। মাটিতে জল ঢুকে জমি কাদা কাদা হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও ওরা ট্যাঙ্কগুলোকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পারেনি। তাই বাধ্য হয়ে ওই সমস্ত ট্যাঙ্ক ছেড়ে দিয়ে সেনারা খালি হাতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ১৪-১৫টা ট্যাঙ্ক আমাদের সৈন্যরা পরেই ARV দিয়ে সরিয়ে নিয়ে আসে।

আমাদের বাহিনীতে যেমন সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক, বিজয়ন্ত ট্যাঙ্ক – মাদ্রাজে তৈরি, পিটি-৭৬, টি-৫৪ রাশিয়ান ট্যাঙ্ক ছিল ওই সময়। এখন অনেক কিছু পাল্টেছে। পাকিস্তানের কাছে ছিল Patton ট্যাঙ্ক যেটা কিনা আমেরিকা ওদের সাহায্য করেছিল। আমরা যে ট্যাঙ্ক কব্জা করেছিলাম তার সবগুলোই ছিল Patton ট্যাঙ্ক। যার একটা এখনো ফোর্ট উইলিয়াম গেট এর কাছে রাখা আছে। ফোর্ট উইলিয়াম ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার। কলকাতা ময়দানে গেলেই ট্যাঙ্কটা দেখতে পাওয়া যায়। পরে একটা আলোচনা সভাতে জানতে পারি Patton ট্যাঙ্ক এত উন্নত মানের যে, যদি পাকিস্তানি সেনারা ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারত, তাহলে আমাদের হয়তো অসুবিধায় পড়তে হতো। সংরুরে সেই আলোচনা সভা হয়েছিল। Patton ট্যাঙ্কের ট্রেনিং ওরা ঠিক মত পায়নি সম্ভবত। পাকিস্তানকে যেমন আর্মস, এমুনেশন, ট্যাঙ্ক দিয়ে আমেরিকা সাহায্য করেছিল, ঠিক সেইভাবে রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করেছিল।

এরকম অনেক ঘটনা হয়তো ভুলে গিয়েছি লিখতে। আবার যখন মনে পড়বে তখন চেষ্টা করব লিখে রাখার। অনেক আগের ঘটনা। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর হয়ে গেছে, অনেক কিছু মনে নেই। চেষ্টা করেও মনে করতে পারছিনা। কেউ সাহায্য করার থাকলে ভাল হত।

(চলবে)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

পারিজাত ব্যানার্জী

ষষ্ঠেন্দ্রিয় ছলনা

পর্ব ৬

মা, মনে আছে, একবার আমরা এক বিয়েবাড়ি যাবো বলে তৈরি হচ্ছি, তখন আমার কত বয়স হবে, বারো কি তেরো, একলার ঘরে মানুষ তো, আনন্দে তাই উদ্বেলিত অন্য ভাইবোনেদের সাথে দেখা হওয়ার আসায় – তুমি হঠাৎ আমায় ডেকে বলেছিলে, “ওখানে কিন্তু সাবধানে থাকবে, কেমন ? আমার ভিতরটা কেন জানিনা অস্থির অস্থির করছে !”

আমি বুঝতে পারিনি একদম, জানো ? বিয়েবাড়ি মানেই তো মজা, হুল্লোড়, আনন্দ ! তাই তো দেখে এসেছি এতকাল ! ওখানে আবার কি বিপদ হবে আমার ? মনে আছে, বাবাও তোমায় বকেছিল সেদিন, “ধুর কি যে বলো না তুমি অনুরাধা ? বাচ্চা মেয়েটাকে হঠাৎ এমন ভয় দেখানোর কি মানে ?”

তুমি আর কথা বাড়াওনি ঠিকই, তবু তোমার মুখে চোখে কিভাবে যেন আমি দেখে ফেলেছিলাম প্লাবণের আগে ঘনিয়ে আসা কালো মেঘেদের নিস্তব্ধতা।

সেরকম কিছুই ঘটেনি যদিও সাংঘাতিক। আমি কেবল ওখানে গিয়েই প্রেমে পড়েছিলাম প্রথমবার – ভুল মানুষের সঙ্গে, ভুল সময়ে, ভুল করে। ফলও যা হবার তাই হয়েছিল – মায়ের মুখে ঘনিয়ে আসা সে প্লাবন আছড়ে পড়েছিল আমার বিক্ষিপ্ত সমুদ্রতটে। আর তুমি শেষমেশ বলেছিলে, “দেখেছিস তো, আমি আগেই বলেছিলাম, আমার মনে ‘কু’ ডাকছে !”

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ! আমাদের রোজকার ব্যবহারের পাঁচ ইন্দ্রিয় পেরিয়ে যার অবস্থান! যে নাকি সব টের পায় আগে থাকতেই – সাবধানও করে শুনেছি তার নিজের মতো করে মস্তিষ্ককে। “উঁহু, সাবধান ! সামনে এগোলেই কিন্তু বিপদ !”

ব্যস, ওইটুকুই ! মস্তিষ্ক পাল্টা যুক্তি সাজিয়ে যখন প্রশ্ন করে, “কই, কিসের বিপদ ? কিছু তো দেখতে পাচ্ছিনা আমি ? তবে কেন এগোবোনা ? এগোতে কিসের বাধা ?” – তখন আর সে কোনো উত্তর দেয় না। একেবারে পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চুপ বসে থাকে সে সুবিশাল এক উপত্যকার মাথায়। এমনভাবে যাতে তাকে ঠিক ঠাহর করা যায়না যেন কিছুতেই!

মস্তিষ্ক অধৈর্য হয়ে ওঠে। “কই, কি হল ? বলবে তো কিসের বিপদ ?” – তবু যখন উত্তর আসেনা, তখন জাগে ভ্রম ! “আমি ঠিকই শুনেছিলাম তো বিপদ আসছে ? নাকি পুরোটাই আমার ভীরু মনের কল্পনা ! নানা, সেরকম হলে তো তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না কোনোমতেই !”

আর অমনি মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নেয়, কাজটা সে করবেই ! কোনোভাবেই আর বিরত থাকবে না সে এইরকম কোনো কুপ্রভাবের ফলে!

তাই যা ঘটার থাকে, সে বিপদ ঘটেই যায় নিজের নিয়মে। দগ্ধ হতে হতে যখন অন্তরাত্মা চিৎকার করে ওঠে, “এরকম কেন হল আমার সাথে, কি অপরাধে আমি হলাম এমন ভুক্তভোগী ?” – ষষ্ঠেন্দ্রিয়র ধ্যানভঙ্গ হয় তখন। সে হাসে,“আমি তো আগেই সাবধান করেছিলাম তোমায় !”

মস্তিষ্ক চমকে ওঠে। আত্মপক্ষ সমর্থনে কথা হাতড়ায়, "কিন্তু আমি যখন তোমার কাছে জানতে চাইলাম, তুমি কেন তবে চুপ করে রইলে ?"

ষষ্ঠেন্দ্রিয় মাথা নাড়ে। "শুধুমাত্র আভাস দেওয়াই যে আমার লক্ষ্য, যাতে তারপরেও ঠেকে শিখতে হলে তুমি অপরাধী হয়ে ওঠো নিজের সত্ত্বার কাছেই ! আজীবন !"

তাহলে বুঝলে তো মা, এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নামের স্ফুলিঙ্গটি ঠিক কতখানি ছলনাময় ? সে তোমায় আসলে আটকায় না কিন্তু, সে শুধু ঝাঁপ মারার পর দূর থেকে চিৎকার করে, "আহা, বেশি ব্যথা পাওনি তো ! মনে করে দেখো, আমি তোমায় কিন্তু আগেই বলেছিলাম !"

ঠিক যেমন পরে তুমি বলেছিলে, "ইশ, আমারই দোষ ! কেন যে ওই বিয়েবাড়িটাতে সব বুঝেও তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম !"

ছেড়ে দাও মা! ওই ছলনাকারীকে আর ওভাবে প্রশ্রয় দিও না !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

রঞ্জন চক্রবর্তী

বিজয়ার প্রণাম

পুজোর সময় এই প্রথম কলকাতায় দাদুর কাছে এল শরতের একমাত্র নাতি ছ'বছরের কুনাল। প্রতি বছর শরৎ নিয়ম করে আমেরিকার স্যান ফ্রান্সিস্কোতে যেত এই সময়টাতে কিন্তু এবার শরীরটা তেমন ভাল নেই বলে বিক্রমকে লিখে পাঠিয়েছিল। পুজোর সময়ে কখনোই ছুটি থাকেনা বিক্রম এবং কাবেরীর। তবে এবারে কাকতালীয়ভাবে ছুটি জুটে গেল। প্রথমে বিক্রম ভেবেছিল একাই বাবাকে দেখতে আসবে কিন্তু দিনক্ষণ ভেবে টিকিট কাটার কথা ঠিক হতেই কাবেরী একদিন অফিস থেকে এসে বলল ওকে অফিসের কাজে কলকাতা যেতে হবে। তখনই কুনালের স্কুলে কথা বলে ওরা ঠিক করল অক্টোবরে গেলেই সবথেকে ভাল। কলকাতার পুজো অনেক দিন দেখেনি ওরা দুজনে। আর কুনাল তো দেখেইনি। কুনালের সবে গ্রেড ওয়ান তাই পড়ার চাপ তেমন নেই। থাকলেও বিক্রম ভাবল এইটুকু ও ফিরে এসে সামলে নিতে পারবে। শুধু তো দু সপ্তাহ। কাবেরীর কাজ এক সপ্তাহের জন্য। সেটা পুজোর আগেই সেরে নেবে। আর পুজোর ঠিক আগে আগে বিক্রম আর কুনাল এসে পড়বে। কটা দিন কাবেরীকে ছাড়া কুনাল ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারবে। আর দাদুর কাছে যাবার জন্য কুনালও বেশ খুশি খুশি মনে রাজি হয়ে গেল। কাবেরী যাবার আগে ওদের দুজনের জামা কাপড়ও গোছগাছ করে স্যুটকেসে রেখে দিয়ে গেল কারণ ও জানে বিক্রম এমনিতেই যা অগোছালো, কুনালকে নিয়ে আরো হিমসিম খেয়ে যাবে।

অবশেষে কয়েকদিনের মধ্যেই কাবেরীকে রওনা দিতে হল আর তার সপ্তাহখানেক পরেই কুনাল আর বিক্রমেরও যাবার সময় এসে গেল। কাবেরীকে ছাড়া ওদের দুজনেরই এই প্রথম থাকা কিন্তু কটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দিল। কাবেরী পৌঁছেই বিক্রমের বাবার ভাল থাকার খবর দেওয়ায় বিক্রম নিশ্চিন্ত হল যে শরীর খারাপ মানে সেরকম কিছু হয়নি। কাবেরী অফিসের কাজের কটা দিন ওর বাপের বাড়ি শোভাবাজারেই কাটাল। তারপর দমদম এয়ারপোর্টে এসে ওদের তুলে নিয়ে একদম চলে গেল টালিগঞ্জে। এয়ারপোর্টে কাবেরীর বাবা, মাও এসেছিলেন ওঁদের প্রিয় দাদুভাইকে দেখতে। ওঁরা আলাদা ট্যাক্সিতে চলে যেতে বিক্রম, কাবেরী আর কুনাল ওদের টালিগঞ্জের বাড়িতে চলে এল। কুনাল শরতের খুব প্রিয়। হয়ত দেখাশোনা কম হয় বলেই টান আরো বেশি। আর হবেনাই বা কেন কুনালের মুখে এমন একটা আকর্ষণ আছে যাকে দেখলে আদর না করে পারা যায়না। শরৎ যখন সান ফ্র্যানসিস্তোতে ওদের বাড়িতে যেত, যে কটা মাস থাকত, কুনাল যেন দাদু অন্ত প্রাণ হয়ে যেত। বাবা মা'র কথা না শুনে ওই কথাই দাদুর কাছ থেকে শুনলে সেটা মেনে নিত এবং করতও কিন্তু অন্য কেউ বললে নয়। এক মনে দাদুর কাছে বসে পুরোন দিনের কত কথা ধৈর্য্য ধরে শুনত। কুনাল এমনিতে লাজুক স্বভাবের কিন্তু একবার লজ্জা ভেঙ্গে গেলে বাবা কিংবা মা'র আড়াল থেকে বেরিয়ে আসত আলাপ জমাতে। শরৎ কুনালের মধ্যে একটা অদ্ভুত কৌতূহলের ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল। সব ব্যাপার ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইত। কেউ ওকে কোন কিছু করতে বললেই করত না। ও আগে জিজ্ঞেস করত কেন এবং ওকে বুঝিয়ে বললে তবেই ও সেটা করত। সবসময় তো বিক্রম কিংবা কাবেরীর ধৈর্য্য থাকত না তাই ব্যাপারটা এক এক সময়ে একটু কঠিন পর্যায়ে চলে যেত। শরৎ ওদের সঙ্গে থাকার সময় এরকম বেশ কয়েকবার দেখেছে। মাঝখানে থেকে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে শিশুর মন বুঝে কুনালকে বোঝাবার চেষ্টা করতে যেত। করতও, কিন্তু কাবেরী রাগ করে উঠত, বিক্রমও। বলত "বাবা, তুমি তো সবসময় থাকবেনা। ওর এত বায়নাক্কা কে সহ্য করবে ?" শরৎ এই কথায় মনে মনে হাসত আর মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ভাবত এই হল শেষ পর্যন্ত। আসলে মনে মনে ভাবত তার নাতি কুনাল তার বাবা মা'র স্বভাব না পেয়ে একেবারে ঠাকুর্দার স্বভাব কি করে পেয়ে গেল ! শরৎও ছোটবেলায় যে ওরকমটাই ছিল।

কলকাতায় প্রথমদিনেই দেখা হবার সময় কাবেরী আর বিক্রম শরৎকে প্রণাম করল আর তারপর দুজনেই কুনালকে একরকম সামনে ঠেলে দিয়েই বলল "যাও, দাদুকে প্রণাম কর।" কিন্তু ফল হল উল্টো । কুনাল নিজেকে পেছনে গুটিয়ে

টেনে বাবা, মা'র আড়াল থেকে বারবার জিজ্ঞেস করল "কেন ? প্রণাম করব কেন ?" শরৎ ওকে ডেকে এনে বুকে জড়িয়ে ধরে আদরে ভরিয়ে আশ্বস্ত করে বলেছিল "থাক, আর অত প্রণাম করতে হবেনা। যখন মন থেকে শ্রদ্ধা আসবে, তখনই প্রণাম কোরো।" এরপর পুজোর কটা দিন বেশ আনন্দে কাটল ওদের সবার। পুজোয় ঠাকুর দেখা। কলকাতার প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়ান আর হাজার হাজার মানুষের ভীড় দেখে কুনাল খুবই আনন্দ পেল। সবথেকে জমাটি সময় ছিল ওর দাদুর কাছ থেকে শোনা নানান সময়ের গল্পগুলো। ওর যত প্রশ্ন জমা ছিল সব যেন একসঙ্গে মনে পড়ত দাদুর কাছে এসে।

পুজোর পালা কাটবার পর আবার সেই প্রণামের রীতি কুনালকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। যে-ই বাড়িতে বিজয়া দশমী করতে আসে তার দিকেই কুনালকে ঠেলে দিয়ে বলা হয় "যাও, প্রণাম কর।" আর যে কে সেই। কুনালও গোঁ ধরে থাকে প্রণাম করবেনা বলে। কটা দিন যেতে একদিন ও দাদুকে খাটের ওপর শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে দেখে আবদার করে জিজ্ঞেস করেই বসল।

– দাদু, আমাকে বলতেই হবে প্রণাম কেন করে ?

– এস দাদু, বলে শরৎও খুব ধৈর্য্য ধরে ওকে পাশে বসিয়ে নিজেও গুছিয়ে বলতে শুরু করল।

– বুঝলে দাদু, ইন্ডিয়ার লোকেরা ছোটবেলার থেকে শেখে বড়দের, মানে গুরুজনদের কাছে মাথা নীচু করতে হয়। তার বদলে গুরুজনেরা বুক ভরা ভালবাসা আর আশীর্বাদ দেন আর মনে মনে ভগবানের কাছে সবার ভাল চেয়ে নেন। কিন্তু শুধু রীতি মেনে প্রণাম করলেই তো হলনা। মন থেকে শ্রদ্ধা না এলে তো প্রণামটা হাঁটা চলা, হাত পা নাড়ানোর মত একটা নিয়মমফিক ব্যায়াম হয়ে যাবে। সেটা তো আর প্রণাম থাকবেনা।

– ব্যায়াম কি ? প্রশ্ন করল কুনাল।

– ব্যায়াম মানে তোমরা যাকে বল এক্সারসাইজ।

– ও, মানে পি. ই ?

– পি. ই?

– হ্যাঁ, আমাদের স্কুলে ক্লাস হয় তো। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ।

– ও, তাই বল। তবে দাদু, বিজয়ার প্রণামটা কিন্তু একটু অন্য ব্যাপার।

– কি ব্যাপার দাদু? বলে কুনাল দাদুর একটু গা ঘেঁষে এসে বসল।

শরৎ বুঝল যে কুনালের কৌতূহলের নিরসন হচ্ছে বলেই ওর ভাল লাগছে। আর ওর শিশু মন হলেও শরৎ বুঝতে পারে, জানে, যে দাদুর কাছেই ও একমাত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পাবে।

শরৎ ব্যাপারটাকে আরো জমানোর জন্য বলল

– দাদু, বিজয়ার প্রণাম করা, খাওয়া দাওয়া রীতি রেওয়াজ শুরুর কারণ বলার আগে তোমাকে আমার জীবনের একটা মজার ঘটনা শোনাই।

– কুনাল আরো মনযোগ দিয়ে শুনতে বসল। ও খুব মজা পায় যখন দাদু মন খুলে পুরোন কথা বলা শুরু করে। এরকম আগেও অনেকবার হয়েছে সান ফ্র্যানসিস্কোর বাড়িতে। তাই কুনাল গালে হাত দিয়ে দাদুর দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগল।

শরৎ বলতে শুরু করল

– জানো তো দাদু, আমরা আমাদের ছোটবেলায় দলবেঁধে বন্ধুরা মিলে পাড়ার সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজয়া করে আসতাম। কে চেনা কে অচেনা কোন মানামানি ছিলনা। সবার বাড়িতে গিয়ে যখনই বড়দের সামনে পেতাম টিপ টিপ করে প্রণাম করতাম। কেন? প্রশ্ন করল কুনাল। "সবাইকে প্রণাম করতে কেন? মন থেকে, শ্রদ্ধা এনে"?

– আরে না না দাদু। আসল মতলব তো ভাল ভাল খেতে পাওয়া। বিজয়ার সময় প্রত্যেক বাড়িতে নানান ধরনের খাবার তৈরী করে রাখা হত। প্রতি বছর বিজয়ার সময় পাড়ায় সবার বাড়িতে বাড়িতে কি সব হত আগে থেকেই খবর পেয়ে যেতাম। প্রণামটা তো একটা গেট-পাস। ওটা না করলে তো খাবার পাওয়া যাবে না। একবার কি হয়েছিল শোন। আমরা এক বাড়িতে গেছি সেখানে এক জেঠু জেঠি থাকতেন। আত্মীয় না। আমরা জেঠু জেঠি বলতাম ওনাদের। জেঠু বড় খিটখিটে মেজাজের ছিলেন বলে শুনেছিলাম আর জেঠি খুব মিশুকে। তা আমরা দলবেঁধে গেছি আর ঘরে ঢুকেই জেঠু, জেঠিকে প্রণাম করে অপেক্ষা করছি এবার আমাদের বসতে বলা হবে আর তারপর খাবারের থালা আসবে। কিন্তু জেঠির কি মনে হল জেঠু আমাদের হয়ত চেনেননা ভেবে আমাদের পরিচয় করাতে লাগলেন এক এক করে। বললেন

– এই দেখ এরা সব পাড়ার ছেলেরা এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে। এ সমীর, এ হল পরিমল। এ পাশের বাড়িতে থাকে, অমল। আমরা তখনও বেশ কয়েকজন বাকি আছি লাইনে দাঁড়িয়ে আমাদের টার্ন আসার জন্য। কিন্তু এই অবধি বলার মধ্যেই জেঠুর মুখের চেহারায় দেখলাম ধৈর্য্যর বাঁধ ভেঙ্গেছে আর শেষে বলেই ফেললেন

– যাকগে যাকগে ওদের খেতে দিয়ে দাও।

– মানে আমরা তো খেতেই গিয়েছিলাম তাই অত পরিচয়ের দরকারই বা কি। সেদিন আমরা খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে এসে নিজেরা খুব একচোট হেসেছিলাম জেঠুর কথাটা মনে করে আর সেই সময় জেঠির মুখটা মনে করে।

– হে হে করে হেসে কুনাল জিজ্ঞেস করল তোমাদের খারাপ লাগেনি ?

– না গো দাদু। আমাদের চোখে তখন শুধু খাবারের ইচ্ছেটা থাকত। কে কাকে চিনল কি চিনল না, বলল কি বলল না তাতে কিচ্ছু যায় আসতনা।

– এবারে কুনালও জোরে হেসে ফেলে একটু আড়ষ্ট হয়েই যেন জিজ্ঞেস করে ফেলল তোমাদের লজ্জা করলনা ?

– শরৎও হাসতে হাসতে বলল না গো একটুও না। তবে এখন সেই সব কথা ভেবে লজ্জা পাই বইকি।

– আরো বল। কুনালের কৌতূহল আরো বেড়ে যায় শোনার জন্য।

– হ্যাঁ বলছি। তবে গল্প নয়। তুমি জানতে চেয়েছিলে না বিজয়ায় প্রণাম কেন করে। সেই কথা বলব।

– হ্যাঁ বল। আমি জানতে চাই।

– আমার যতদূর জানা আছে, এখন বিজয়াকে যেরকম আনন্দ উৎসব হিসেবে সবাই দেখে, আগেকার দিনে মানে কয়েকশো বছর আগে জান তো, এটা মোটেই তা ছিলনা। তখনকার দিনে ছোট ছোট রাজত্ব নিয়ে সেখানে বাংলার রাজারা থাকতেন। আর মাঝেমধ্যেই যুদ্ধ লেগে যেত। বাইরে থেকে আক্রমণ হত। কারণ সবারই উদ্দেশ্য নিজেদের সাম্রাজ্য বাড়ানোর। আর যুদ্ধ করার আসল সময় তো দুর্গাপুজোর শেষের সময়টা। কারণ দশমীর দিন রাম যুদ্ধে রাবণকে হারিয়েছিলেন। তাই এই সময়টাকে খুব শুভ মানা হয়। কিন্তু সেই ছোট ছোট প্রদেশের রাজাদের তো আর বড় বড় সৈন্যদল ছিলনা। তারা নিজেদের প্রাদেশিক অঞ্চলের লোকেদের নিয়েই যুদ্ধ করতেন। যুদ্ধে যাবার আগে যারা সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে নামত, তারা বড়দের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিত যাতে যুদ্ধে জিতে আসতে পারে।

– প্রণাম কেন ?

– কারণ ভারতীয় প্রথায় আমরা বহুকাল আগে থেকে শিখে এসেছি যে বড়দের শ্রদ্ধা করতে হয়। শুধু যে তাদের বয়স বেশি তা তো নয়। তার সঙ্গে বুদ্ধি, বিচার বিচক্ষণতা সবই। তাই তাঁদের কাছে মাথা নীচু করতে হয়। আর প্রণাম করতে গেলেই তো মাথা আপনা আপনিই নীচু হয়ে যাবে। প্রণাম করলে তখন বড়রা আশীর্বাদও করতেন আর ভাল ভাল খাবারও খেতে দিতেন কারণ যুদ্ধের শেষে সেইসব সৈনিকরা যে বেঁচে ফিরবেন তার তো কোন ঠিক ছিলনা। তাই বাড়ির বৌরাও সিঁদুর দিয়ে একে অপরের মঙ্গল কামনা করতেন যেন যুদ্ধের শেষে সেই সিঁদুর না মুছে ফলতে হয়।

– মানে ?

– মানে যুদ্ধে স্বামী মারা গেলে তো তাদের বৌ'রা বিধবা হয়ে যাবে। আর বিধবাদের সিঁদুর পরতে নেই।

– কেন ? বিধবাদের সিঁদুর পরতে নেই কেন ?

– সে কথা দাদু আর একদিন হবে। আজ এইটুকুই।

না চাইলেও কুনাল শেষে দাদুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ও ঘর থেকে কাবেরীর ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল যে। পরের দিন সকাল হতে না হতেই শরৎকে ডাকাডাকি করতে লাগল কুনাল। বলতে লাগল

– দাদু আজই আমাদের চলে যেতে হবে বাবা মা বলছে। তোমার গল্পগুলো শেষ কর। ওঠ, তাড়াতাড়ি। শরৎ কি আর করে উঠে মুখ ধুতে ধুতে ভাবতে লাগল সত্যিই, এই কটা দিন যেন খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল। জলখাবার খেয়ে নিতেই কুনালের তাড়ায় বাইরের ঘরে গিয়ে বসল।

– বল এবার।

– ওরে দাঁড়া। একটু গুছিয়ে নিতে দে আগে। তারপর বলছি। কি বলছিলাম যেন ?

– তোমাদের ছোটবেলার কথা।

– ও হ্যাঁ। আমরা বন্ধুরা মাঝে মাঝে যার তার বাড়িতে ঢুকতাম বিজয়ার সময় বলছিলাম না ? তা সেই সব বাড়িতে ঢুকে পড়ার আগে অনেক সময় একটা বানানো নাম ঠিক করে রাখতাম। যেমন ধর স্বপন কিংবা অরূপ এইরকম নাম যে নামে পাড়ায় কেউ না কেউ থাকবেই। আমরা বলতাম আমরা স্বপনের বন্ধু বা অরূপের বন্ধু বলে তাদের মা বাবাকে প্রণাম করে সেই বিজয়ার নিমকি, ঘুগনি মিষ্টি খেয়ে আসতাম। আসলে আমরা বোঝাতে চাইতাম যে আমরা একেবারে অচেনা না। একটা কিছু কানেকশান আছে। এও জানতাম তো যে সে বাড়িতে যদি স্বপন বা অরূপ থেকেও থাকে তবে সেও তো বেরিয়ে পড়েছে বিজয়া করতে বাড়ি বাড়ি। তাই ধরা পড়ারও সুযোগ নেই। সেইরকম একবার আমরা এক বাড়িতে গেছি রাজু বলে এক বন্ধুর নাম নিয়ে। সেই বাড়িতে বয়স্কা এক বিধবা মহিলা ছিলেন। মনে হল একাই ছিলেন। এর আগে আমরা কোনদিন ওই দিকটায় যাইনি কিন্তু সেই দিন কি মনে হওয়াতে আমরা চলেই গেলাম। আমরা সেই মহিলাকে বললাম আমরা রাজুর বন্ধু। বলেই সবাই টিপ টিপ করে প্রণাম করলাম। উনি বললেন থাক থাক বাবা, বলে আমাদের বসতে বললেন আর মনে হল ভেতর থেকে খাবার আনতে গেলেন। আমরা ভাবলাম ইনি নিশ্চয় সত্যি করে রাজুর মা। বাড়িটা বড্ড চুপচাপ দেখে আর ধরা পড়ার ভয়ে আমরা জিজ্ঞেস করলাম রাজু আছে ?

– উনি বললেন আছে। তোমরা বস, খেয়ে নাও। আমি রাজুকে ডাকছি।

– আমরা তো তখন কোনমতে খাবার খেয়ে রাজুকে ডেকে আনার আগেই পালাতে পারলে বাঁচি। মনে মনে ভাবছিলাম রাজু যদি বেরিয়ে এসে বলে এদের কাউকে চিনিনা, তখন কি দুর্গতিটা হবে আমাদের ! কিছুক্ষণ পর মহিলা একটা কুকুরকে এনে আমাদের সামনে এনে বললেন

– এই তো রাজু।

– আমরা বললাম মানে?

– দেখ বাবারা এই বিজয়ার সময় তোমরা সকলে এসে দুটো খেয়ে যাও, আমার যে কি ভাল লাগে। কেউ এসে রাজুর নাম নেয় কেউ কেউ নেয় অমিতের। আমি তো জানি তোমরা বিজয়ার অজুহাতে দুটো খেতেই আস। আমার তো সারা বছর একা একা এই ভুলু কুকুরটিকে নিয়েই সময় কাটে। আমার তো আর কেউ নেই তাই বছরের এই সময়টাতে আমি কিছু রান্না টান্না করে রাখি। মিষ্টি এনে রাখি যাতে তোমাদের দিতে পারি। এই ভুলুই কোন বছর রাজু হয়, কোন বছর অমিত। বলে ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন।

– ভদ্রমহিলার কথা শুনে আমাদের কিরকম যেন একটা কষ্ট হল। ঠিক হাসি পেল না। একরকম মায়াও হল বলতে পার। সেদিন আমরা তাঁকে আর একবার সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করেছিলাম। তারপর প্রতিবছর আমরা তাঁর কাছে যেতাম। যা দিতেন তাই খেতাম আর একটু গল্প করে আসতাম। ওনারও ভাল লাগত আমাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে।

– তিনি এখন কোথায়? কুনালের যেন নেশা লেগে গেছে। খুব কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করে বসল।

– কি জানি কোথায়। বেঁচে আছেন কিনা তাও জানিনা।

এরপর কুনালের ডাক পড়ল ঘরের ভেতর থেকে। কাবেরী ডাকছে তৈরী হয়ে নিতে। সকাল সকাল চান সেরে রাখতে। তাহলে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করেই বেরিয়ে পড়বে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। এবারে কিন্তু কুনালকে আর দুবার জিজ্ঞেস করতে হলনা। এই কদিনেই যেন দাদুর সঙ্গে থাকতে থাকতে ও বড় হয়ে গেছে কিছুটা। যাবার সময় গাড়িতে মালপত্র তুলে কুনাল জেদ ধরল দাদুকেও এয়ারপোর্টে যাবার জন্য। শরতের এয়ারপোর্টে যেতে একেবারেই ভাল লাগেনা। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায় সবকিছু। কিন্তু কি আর করে নাতির জেদের কাছে হার মেনে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে যেতেই হল। কলকাতার এয়ারপোর্টে বিক্রম আর কাবেরী একটা কার্ট এনে মালপত্রগুলো তুলে গুছিয়ে রাখছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করল কুনালকে কোথাও দেখা যাচ্ছেনা। কুনাল কোথায় কুনাল কোথায় এদিক ওদিক দেখতে দেখতে শেষে গাড়ির ড্রাইভার আলম দেখল কুনাল কখন গাড়ির ভেতরে ঢুকে বসে আছে মুখ লুকিয়ে। কাবেরী ওকে এ মা ছি ছি কাঁদছ কেন বলাতে কুনাল বলল কই কাঁদছি না তো বলে গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই দাদুকে প্রণাম করল। বিক্রম আর কাবেরী একটু অবাক হলেও মুখে কিছু বললনা। তারপর হাত নেড়ে ওদের তিনজনকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে গাড়িতে বসল শরৎ। আলমকে বলল

– একটু আস্তে আস্তে চালাও তো। সময়টা বড্ড তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে।

– আলম হে হে করে হেসে বলল বাবু, আমি আস্তে চালালে সময় কি আর আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আস্তে চলবে?

– ঠিক আছে ঠিক আছে। তোমাকে অত ওস্তাদি করতে হবেনা বলে চশমাটা খুলে চোখদুটো একটু মুছে নিতে গিয়ে পায়ের দিকে চোখ পড়ল শরতের। ওখানে যে ওর আদরের নাতি দাদুভাইয়ের প্রণামের ছোঁয়াটা লেগে রয়েছে। মনে মনে নিশ্চিত যে সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গেই করা।

মেজদার দোকান-২

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

সমরেশ বসুর দুনিয়া

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তরের বাংলা, দাঙ্গা তারপর দেশভাগের বাংলা। যুগ যুগ জিয়ে থেকে খন্ডিতা। এই যে ইতিহাস, তাকে কি আমরা জানি? মেজদার দোকানে আমাদের সন্ধ্যেগুলোতে তখন বুঝতে চাইছিলাম, কাকে বলে ভুলে যাওয়া ইতিহাস। যাকে আমরা আগের আড্ডায় অচর্চিত ইতিহাস বলেছি, তাকে সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে আসায় সাহিত্যের ভূমিকা কি রকম হয়?

ঋত্বিক ঘটকের সুবর্ণরেখায় সেই যে হরপ্রসাদ বলেছিল, 'এরা যুদ্ধ দেখে নাই, মন্বন্তর দেখে নাই, দেশভাগ দেখে নাই ...' । মফস্বলের সেই ধুলোধোঁয়ার সন্ধ্যেতে আমাদের চায়ের টেবিলে বারবার ফিরে আসছিল, কিভাবে না দেখা নাতিদূর অতীত ইতিহাসকে, মানুষের ইতিহাসকে বিস্মৃতির পর্দার পেছনে, ভুলে যাওয়ার সিন্দুকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দেখতে দেওয়া হয় না। আসলে এই অচর্চিত ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে। নেই করে দেবার নিরন্তর প্রয়াস। কখনো রাষ্ট্র, ইতিহাসের ভূগোলের সিলেবাস টেক্সট বইএর মধ্যে দিয়ে ভোলাতে চাইছে। আবার আমরা নিজেরাই কখনো ভুলতে চেষ্টা করি অপ্রিয় সত্য বা ইতিহাসকে। ধীরে ধীরে সেই সত্য, বেশিরভাগ সময়েই নির্মম সত্যকে চেপে যাওয়া বা ভুলে যাওয়ার কসরত চলতেই থাকে। এইভাবে ঘাম রক্তেভেজা ইতিহাস চাপা পড়ে যায় বিস্মৃতির আগাছার তলায়। রাষ্ট্র-স্টেট এবং ওপরতলার পছন্দমতো স্মৃতি আমাদের জগতে রাজত্ব চালায়। কাঁচা বাংলায় মগজধোলাই সার্থক করতে পারলেই যুদ্ধজয় শেষ হয়।

এসব কথায় যখন আমাদের বন্ধুরা টেবিল গরম করে চলছে, তখন মেজদা খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত ছিল। সেঁকা পাঁউরুটিতে মাখন চিনি কালো মরিচ মাখানো শেষ করে মেজদা আড্ডার টেবিলে এসে প্রথমেই বলেছিল, 'জটিল এ্যাবস্ট্রাক্ট কথা রাখুন। আসলে সবাই নিজের মত করে সত্যিকে তৈরি করে। আর মেমারিতে সেটাই রাখতে চায়।' একমাত্র সত্যি বলে চালাতে চায়। দেখুননা, দ্বিতীয় যুদ্ধের পাঁচ মাসে জার্মানি, গোটা ফ্রান্স কিকরে দখল করেছিল? শুধুমাত্র জার্মান অস্ত্রবল? তাই লোকে বিশ্বাস করেছিল। আসলে ফরাসি নেতারা হার আগেই স্বীকার করে নিয়েছিল। সমাজের ওপরতলার ব্যবসায়ীদের জার্মানির সঙ্গে ব্যবসার লোভে জিভ লকলক করছিল, একথা কোন কাগজে লেখা হোত? এমনকি স্কুলের বইতেও এখনো থাকে না। আপনাকে আসতে হবে সাহিত্যের কাছে। ইলিয়া এরেনবুর্গের 'পারির পতন'। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, ফরাসি সমাজের ওপরতলা কেমন করে ভেতর ফাঁপা হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মেজদা, আমাদের দেশে দাঙ্গা হোল, ভোটাভুটি করে মুসলিম লীগ অনেক ভোট পেল দেশভাগ হোল। এককথায় ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া চল্লিশের বাংলা তো সাহিত্যে যথেষ্ট এসেছে?

'না দাঙ্গা তেমন ভাবে আসেনি। দেখুন ভেবে। দেশভাগ এসেছে। তার যন্ত্রণা, স্মৃতি এসেছে। কিন্তু দাঙ্গা তার হিংস্র ভায়োলেন্ট দৃশ্য বা চরিত্র নিয়ে আসেনি। পাঞ্জাবে এসেছে। পাঞ্জাবি এবং উর্দু সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। ইন্তিজার হুসেন, কৃষ্ণা সোবিত, কৃষনচন্দ্র, রাজেন্দ্র সিং বেদি, মন্টো, ভীষ্ম সাহনি একের পর এক দাঙ্গাকে সামনে রেখে বুকের মধ্যে দাগ বসানো সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিলেন। উল্টোদিকে গোটা বাংলায়, রাজধানী কোলকাতায়, একের পর এক দাঙ্গা হয়েছে। সেই ১৯০৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে, কোলকাতাতেই বিশের দশকে অন্তত দুবার বড়রকমের দাঙ্গা হয়েছিল। আর ১৯৪৬ এর দাঙ্গা তো বাংলার রাজনীতির মোড় ঘুরিয়েছিল। কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞাসা করলে সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে কোন উপন্যাসের নাম বলতে পারবেন না যাতে সরাসরি দাঙ্গা চরিত্র হিসেবে এসেছে।'

আমরা সব বন্ধুরাই স্বীকার করেছিলাম যে মেজদা, ফাঁকা জায়গাটা ঠিক লক্ষ্য করেছে। বাংলায় বিশের দশকে ‘কল্লোল’কে কেন্দ্র করে নতুন ধারার সাহিত্যগোষ্ঠী এসেছিল। অপরদিকে ‘মোসলেম ভারত’, নিজামুদ্দিনের ‘শিখা’ পত্রিকা। ত্রিশ দশকের গোড়াদিক থেকে ‘দেশ’ পত্রিকা-এতসব নতুন সমাজমুখী রিয়ালিস্টিক সাহিত্যের নানা মোড় বা ধারা এসেছে কিন্তু দাঙ্গা জর্জরিত বাঙলায় দাঙ্গাকে সাহিত্যের বিষয় করতে সে যুগে সব ধারাই এড়িয়ে গেছে। অনেকপরে এসেছেন গৌরকিশোর ঘোষ। ‘প্রেম নেই’ এবং ‘প্রতিবেশী’ উপন্যাসে। উনি ট্রিলজি মধ্যে দিয়ে সমস্যাটাকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। অথবা জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ কিংবা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। বরঞ্চ শিল্পী প্রকাশ কর্মকার তাঁর স্মৃতিকথা ‘আমি’ তে চোখের সামনে দেখা দাঙ্গার নারকীয় অত্যাচার হত্যার বর্ণনা দিয়েছেন।

মেজদা চা খেতে খেতে পেঁয়াজ কুঁচচ্ছিল। মাথা নিচু অবস্থাতেই বলতে লাগল, দাঙ্গা মানে দেশভাগ নয়। দেশভাগের সাহিত্য বলতেই ওয়ালিউল্লাহ, অতীন, সেলিনা জাহান এরকম অনেক নাম মনে আসবে। কিন্তু দাঙ্গা। কোলকাতার ছেচল্লিশের আগস্টের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। তার বদলায় নোয়াখালি-টিপেরা। আবার পালটা ভাগলপুরে। তার পরেই উত্তর প্রদেশের গড়মুক্তেশর। এসব খবর, ইতিহাস, সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের পুরনো বন্ধুরা বলেছিল, তা অবশ্য ঠিক। এসব ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের রিসার্চ পেপারের দ্বারস্থ হতে হয়। জয়া চ্যাটার্জি,সুরঞ্জন দাস,সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি আরো অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাছে যেতে হবে। কিন্তু খুব কম সাধারণ মানুষ আলাদা করে এসব চর্চা করে। তাও আবার বেশির ভাগ এসব বই বাংলায় পাওয়াও যায় না। সাধারণ মানুষ লোকমুখে একতরফা ইতিহাস শুনে এসেছে। ফলে দাঙ্গার ইতিহাস গল্পকথায় পরিণত হয়ে গেছে। হিন্দুর ইতিহাস, মুসলমানের ইতিহাসের জামা পরে আমাদের মনের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়ায়। সাধারণ পাঠকের কাছে সাহিত্য তার দায়িত্ব পালন করেনি। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘দেশভাগ: বাংলা সাহিত্যের দর্পণে’ বইতে এই প্রশ্ন তুলে উত্তর খুঁজেছেন। সোশ্যালসাইকোলজিস্ট আশিস নন্দী তো সরাসরি লিখেছেন, ‘Though half the killing had taken place in that part of the world (বাংলা), the literary imagination there had obstinately refused to rise to the situation.’

মেজদা সেদ্ধ আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলেছিল, ‘যেসব সাহিত্যিক পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে, হয়ত ছেলেবেলায়, তাঁরা সবাই উচ্চবর্ণের মধ্যসত্ত্বভোগী সামাজিক স্তর থেকে এসেছিলেন। ফলে তাঁদের লেখায় ছেড়ে আসা ধানের মড়াই, পাকা দালান-কোঠা-ঠাকুর দালান বারবার এসেছে। এইসব লেখকদের পরিবারদের বেশিরভাগকেই সরাসরি দাঙ্গার বীভৎসতার মুখোমুখি হতে হয়নি। আর যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওপার বাংলায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের আবার অন্য সমস্যা। অনেকেই উর্দু ঘেঁষা হিন্দিভাষী। উর্দুভাষীদের মত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের বেশিরভাগ অংশ পাকিস্তান চেয়েছিলেন। স্বপ্ন হাতে পাবার তৃপ্তি মিটতে না মিটতেই ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বপ্নভঙ্গের পালা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ধরুন না, ছেচল্লিশের ১৬ই আগস্ট, ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে, পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকরা চোখের সামনে দেখেছিলেন। কিন্তু সহজে কোন সাহিত্যে পাবেন না। আপনাকে সমরেশ বসুর যুগ যুগ জিয়ের কাছে আবার আসতে হবে।’

সেই সন্ধ্যেয় আবার আমরা যুগ যুগ জিয়েতে ফিরে গিয়েছিলুম।

বুঝতে চাইছিলুম কিভাবে এই কোলকাতা রায়ট, নোয়াখালি-টিপেরা এবং ভাগলপুর দাঙ্গা বাঙালিকে দেশভাগের দিকে ঠেলে ছিল।

যুগ যুগ জিয়ে আত্মজৈবনিক উপন্যাস। নায়ক ত্রিদিবেশ শিল্পী মানুষ। সে কমিউনিস্ট পার্টির লোক। তার জীবন আর চোখের মধ্যে দিয়ে চল্লিশের কোলকাতা, তার মফঃস্বল, পার্টির আমলাতান্ত্রিক নির্মম নেতৃত্ব সমস্ত কোলাজ দৃশ্য হয়ে এ উপন্যাসে এসেছে।

ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডের বিকেল বেলা, এইভাবে এসেছে, ত্রিদিবেশের চোখ দিয়ে। কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা জিপ গাড়িতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ আর কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা একসঙ্গে লাগিয়ে প্রথমে হিন্দু পাড়ায়। কিছু লাঠি হাতে জনতা আটকে দাঁড়ায়। 'পুলিশ তো আমাদেরই মারছে। শুয়োরের বাচ্চারা আমাদের মেরে নেড়েদের মহল্লা পাহারা দিচ্ছে। হিন্দু দারোগা গুলোও শালা বেইমান, চাকরির ভয়ে আমাদের শাসিয়ে গেল। তবে আমরাও তোয়ের হয়ে আছি।' গর্জিত স্বর শোনা যায়, 'জিজ্ঞেস কর গাড়িতে দু-চারটে নেড়ে আছে কিনা, টেনে নামিয়ে নে।'

জিপের মধে থেকে একজন বলে ওঠে 'আমরা মুসলমান এলাকাতেই যাচ্ছি, আটকে পড়া হিন্দুদের জন্য। আমাদের কাজ রেসকিউ করা। দাঙ্গা আজ আছে, কাল থাকবে না। কিন্তু আমরা যদি কারোকে বাঁচাতে পারি সেই চেষ্টাই করছি।'

পাশ থেকে গলা ভেসে আসে, 'আরে যার সঙ্গে কথা বলছিস সে হিন্দু না মুসলমান, তা কি জানা আছে?'

' আমরা জাতটাত ভেবে বেরোয়নি, আমরা কমিউওনিস্ট। আমরা শান্তির জন্য বেরিয়েছি।'

'এই মোসাই, বেশি রোয়াব দেখাবেন না। ফুটানি করবেন তো ন্যাংটো করে দেখে নোব, কে হিন্দু কে মুসলমান। ওসব কমিউনিস্ট-টমিউনিস্ট গুলি মারো। আমরা বদলা চাই বদলা।'

গাড়ি এগোয়, পেছন থেকে আওয়াজ আসে, 'এ শালারাও নেড়েদের দালাল। পাকিস্তানের সাপোর্টার।'

গাড়ি এন্টালি পেরিয়ে মুসলমান পাড়ায় যায়। একজন যাত্রী বলে, 'এন্টালির ভেতর আগুন জ্বলছে। নাকে পোড়া গন্ধ লাগছে। ডানদিকে দুটো ডেডবডী পড়ে আছে।'

জিপ দাঁড়িয়ে পড়ে, ব্যারিকেডের সামনে। চিৎকার শোনা যায়, 'তুমলোগ কৌন হ্যায়?'

'আপনি তো আমাদের ঝান্ডা দেখেই বুঝতে পারছেন আমরা কারা।'

'ভেতর দিয়ে যেতে দেব না।'

একজন হিন্দিতে বলে, 'এ গাড়ি আমরা যেতে দোব। কিন্তু মহল্লায় রাত্রিতে থাকতে দোব না। ও সব লাল ঝান্ডা মানিনা, কাল খবরের কাগজে যা-তা লিখে দেবে। আপনারা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান, দু পাশে তাকিয়ে দেখবেন না।' ত্রিদিবেশের মনে পড়ে গিয়েছিল, ধর্মতলা স্ট্রিটে ঢোকার সময় সে দেখেছিল চার-পাঁচজন ব্রিটিশ সাহেব-মেম গলা জড়াজড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। ত্রিদিবেশের মাথায় এসেছিল যাদের প্রভুত্ব শেষ হচ্ছে তারা হাসতে হাসতে নির্বিঘ্নে ঘুরছে। ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করছে তারাই, যারা স্বাধীনতা পাচ্ছে।

সে রাতে বাড়ি ফেরার পথে আমাদের নাকে যেন মাংস পোড়ার গন্ধ, পেট থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের গন্ধ এসে লাগছিল। মেজদা দোকান বন্ধ করতে করতে বলেছিল, 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং হয়েছিল ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ আর দেশভাগ হয়ে স্বাধীন হোল ঠিক একবছর পর ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭। খন্ডিতা উপন্যাস সেখান থেকেই সমরেশ শুরু করেছিলেন।'

(২)

'উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রীস্টাব্দ। চোদ্দই আগস্ট।' বিকেলবেলা ... সাইকেল রিকশায়, মাঝখানে চরকা ছাপা তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে মাইকের ঘোষণা ভেসে আসছে, 'বন্ধুগণ! আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে...।' খন্ডিতা উপন্যাস শুরু হয়েছে এইভাবে।

খন্ডিতা পূজাবার্ষিকীর জন্যে ফরমায়েশি উপন্যাস। ফলে নিয়ম মেনে খুবই ছোট উপন্যাস। এককালে যাকে বলা হত উপন্যাসপম বড় গল্প। এ উপন্যাসের ব্যাপ্তি বিশাল হওয়া উচিত ছিল। কারণ যুগ যুগ জিয়ের মত এ আখ্যানের ক্যানভাস বিরাট মাপের। এই ধরণের পটভূমিকে চটজলদি পূজাবার্ষিকীর খাপে বেঁধে রাখা আমাদের অস্বস্তির মাঝে ফেলে দেয়। অনেকদিন আগে দেবেশ রায় একবার একথা সমরেশ বসুকে বলেও ছিলেন।

এ উপন্যাসে তিনবন্ধু স্বাধীনতার দিন ওপার বাংলা দেখতে বেরিয়েছে। 'ওরা' কিভাবে উৎসবকে সাজাচ্ছে, তাই দেখার ইচ্ছে। তিন বন্ধুর মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে, একবছর আগের দাঙ্গার শুরু, স্বাধীনতা আন্দোলনের অজানা গভীর ক্ষত আর তার থেকে জন্ম নেওয়া মোড় ঘোরানো বাঁক।

উপন্যাসের আরম্ভেই মনসুর মল্লিক বলে এক চরিত্র এসেছে। সে ফজলুল হকের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি পাকিস্তান চান কিন্তু মিলমিশ আলাপের মধ্যে দিয়ে, কাজিয়ার মধ্যে দিয়ে নয়। '...আপনারা ভুলে যাবেন না, কংগ্রেসের নয়া প্রেসিডেন্টের একটা কথা কে, কায়েদে আজম জিন্না সাহেব মেনে নিতে পারেন নি। আমি মনে করি, জওহরলালজীও উচিত কথা বলেন নি। কংগ্রেস ক্যাবিনেট প্ল্যান মেনে নিয়েছে, তারপরেও উনি বললেন, তা বলে সার্বভৌম গণপরিষদের মত কংগ্রেস মেনে চলতে বাধ্য নন। অথচ ষোলই মে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে, এক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ একমত হওয়াতে সকলের মন নেচে উঠেছিল। আর দশই জুলাই এরকম একটা কথা জহরলালজী বলে দিলেন!! জিন্না সাহেব রেগে আগুন।'

আমরা খন্ডিতা উপন্যাসের শুরুতে এরকম উক্তি পেয়ে বুঝেছিলাম, আবার সমরেশ পাঠককে ভুলে যাওয়া বা না জানা ইতিহাসের দিকে ঠেলে দিলেন। যাকে আমরা অচর্চিত ইতিহাস বলেছিলাম।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম বড় অধ্যায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি-দাঙ্গা-দেশভাগ। আর সেই অধ্যায়ের মাইলস্টোনগুলো শুরু হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে। এরপর থেকে পরপর তিলক-জিন্না প্যাক্ট, নেহরু রিপোর্ট, জিন্নার চোদ্দ দফা প্রস্তাব-মুসলিম লিগের পাকিস্তান প্রস্তাব। সবশেষে ক্যাবিনেট মিশন সমঝোতা। সমরেশ, মনসুর মল্লিকের মুখ দিয়ে এই ইতিহাসের দিকে পাঠকের চোখ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এ সেই মেমরি, আমাদের স্কুল টেক্সটবুক ইতিহাসে যে অধ্যায়কে বাদ দেবার চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে।

তিনবন্ধু যখন সদ্যজন্ম নেওয়া পূর্বপাকিস্তানের মধ্যে ঢোকে তাদের আলাপ হয় জাব্বর বলে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আর সৈয়দ মনিরুজ্জমান বলে এক উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীর সঙ্গে।

তিনবন্ধুর একবন্ধু জিজ্ঞেস করে, 'এই দেশ বিভাগ কি অপরিহার্য ছিল?' মনিরুজ্জমান বলেন, 'একটা কথা জিগাই। আপনাদের কোন রাজনৈতিক আদর্শ বা মতামত আছে?'

'আদর্শ আছে কিনা বলতে পারি না। তবে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে সমর্থন আছে।'

'আমি তো দেখি গোড়ায় গলদ। কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায় ছাড়া, কমিউনিস্ট পার্টি তো অনেক আগেই পাকিস্তানের দাবি ন্যাশনাল মাইনরিটির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বলে মাইনা নিছেন।'

আমরা আবার সেদিন বুঝতে পারছিলাম, খন্ডিতা আমাদের আবার ভুলে যাওয়া ইতিহাস বা ভুলিয়ে দেওয়া ইতিহাসের সামনে নিয়ে আসে। আজকের পাঠকদের খুব কমজনই জানেন যে পাকিস্তানের দাবি কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করেছিল। কংগ্রেস-মুসলিম লীগ সমঝোতার মধ্যে দিয়ে দুটি ডোমিনিয়নের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি তখনও আসেনি।

কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর 'recognition of the right of separation of individual nationalities' এবং কমিউনিস্ট পার্টির দলিল-Pakistan and National unity। এই দলিল অধিকারী থিসিস বলে

পরিচিত ছিল। দেশভাগ হবার পর এই দলিলকে সমালোচনা করে এই অধ্যায়কে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা পার্টির নতুন নেতৃত্ব করেছিল। সমরেশ যেন আবার পাঠককে বলেছিলেন ফিরে গিয়ে না দেখা ইতিহাসের সামনে বসতে।

খন্ডিতা শেষ হয় যখন তিনবন্ধু জিপসি ক্যাম্পে মোতি বলে এক মেয়ের সামনে আসে। তার হাত কাটা পড়েছে গুন্ডাদের হাতে। তাকে তিনবন্ধুর এক বন্ধু সতু জিজ্ঞেস করে, 'তুমি হিন্দু না মুসলমান ?'

'আমরা না হিন্দু না মোছলমান। মা কালী ভজি, পীরেরও ভজি। রুদ্রাক্ষ পরি, তসবিও পরি। গরু খাই, শুয়োর খাই। আমারে হিন্দুও খায়, মোছলমানও খায়। আমি জমিন। জমিন সবাই চায়। সবাই চষে। জমিন লইয়া খুনোখুনি করে।'

খন্ডিতা পড়তে পড়তে সেদিনও রাত শুনশান হয়ে গিয়েছিল। মেজদা বাড়িমুখো হবার সময় বলেছিল, এই খন্ডিতাতেই আপনারা পাবেন র‍্যাটক্লিফ লাইন তৈরির রাজনীতি আর দাঙ্গা। সমাজতত্ত্বের আঙিনায় যাকে politics of map making বলে।

আমরা কয়েকটা প্রাণী ভারতের ইতিহাস আর ঐতিহ্যর সামনে পা মুড়ে বসব ভেবে বাড়ি ফিরেছিলাম।

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় – সত্তরের দশকে ছাত্রজীবন কেটেছে। ওই দশকের ভালো খারাপ সবই তার মধ্যে আছে। বর্তমানে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে লেখালিখিতে ব্যস্ত থাকা এবং সাহিত্য, সামাজিক ইতিহাস-অর্থনীতির প্রবন্ধ আর ছোটগল্পর জগতে বিচরণ প্রধান ইচ্ছা।

সুব্রত ঘোষ

অতলান্ত কথা

নিরালা ঢেউয়ের পাশে (আবিদয্যান – ১) পর্ব ৩

সূর্য নেমে আসছে সমুদ্রের বুকে। আর কিছুক্ষণ পরেই জল এসে আমার শরীর ছোঁবে। এই অশেষ জলরাশি আমার মতো এক অতি নগণ্য অস্তিত্বকে মুহূর্তের জন্যে হলেও ভালবেসে যাবে, – এ কথা মনে আসতেই সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। কি অদ্ভুত গভীর নীল রং তোমার হে আটলান্টিক ! আস্তে আস্তে দেখলাম আলো কমে এলো। আমি যেন নীল রং এ ভিজে গেলাম। পড়ে রইলাম বেলাভূমিতে, উঠতে ইচ্ছে করলো না। এ আমার যেন এই মহাসমুদ্রের কাছে আত্মসমর্পন। সকাল থেকে সারাদিন এই নীল সমুদ্র কেমন যেন মোহাবিষ্ট করে রাখে। চোখে ঘোর লাগে। এ আমাদের পুরী কিংবা দীঘার সমুদ্রের থেকে অনেক আলাদা। এ সমুদ্র যেন গভীর চোখ দিয়ে ডাকে। যেন ঘুমের গহন আঁধারের কেউ অবচেতন কে অধিকার করে আছে।

জীবনানন্দের কথায় বলতে পারি :
"অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয় ;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে.
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিয়ে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার
সাধ ভালোবেসে।"

– (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

আইভরি কোস্ট, মানে Côte d'Ivoire (কোৎ দি'ভোয়া) .... এই অসীম আটলান্টিকের গায়ে লেগে থাকা পশ্চিম আফ্রিকার এক মায়বী দেশ। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় শহর আবিদয্যান (Abidjan), এখানেই আটকে আছি কিছুদিন। দাকার যাওয়ার আগে এই শহরের মায়ার বাঁধনে জড়ালাম মনে হচ্ছে। এখানকার মানুষজনের মুখশ্রীতেও কেমন যেন মায়া লেগে আছে। ঐ যে আমার দিকে যে ছেলেটা এগিয়ে আসছে, ওর নাম কোবে। কি সুন্দর মায়াময় মুখ, হাতে এক

প্লেট মাছ ভাজা। এক হাসির ঝিলিক দিয়ে প্লেট টা আমার সামনে ধরল – 'S'il vous plait'। এই অনুরোধ তো আর ফেলা যায় না। সদ্য মাছ ধরে, ওখানেই আগুন জ্বেলে মাছগুলো ভাজা হচ্ছে। সমুদ্রের মাতাল হাওয়া কোবের এই মাছ ভাজাকে এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে কাঙ্খিত বিষয় প্রতিপন্ন করেছে, কোনো সন্দেহ নেই। কোবেকে ধন্যবাদ জানাতেই ও উৎসাহীত হয়ে বিভিন্ন মাছ সম্পর্কে কথা বলতে লাগলো। আজ সারাদিন এখানে অনেক sketch করেছি। সমুদ্রের পারে জেলেদের আড্ডা। নৌকো টেনে টেনে সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে মাঝিরা। কিংবা নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলো ছায়ার খেলায় পৃথুলা কৃষ্ণাঙ্গীদের মাছের ঝুড়ি নিয়ে ফেরা। রোদ্দুরের আলো কপাল ছুঁয়ে নাকের মাথা বেয়ে মোটা ঠোঁটে লেগেছে। পাথরের মূর্তির মধ্যে যেন প্রাণ ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এই সব খন্ড চিত্রাবলী ধরা দেয় আমার কাছে। কোবে অনেকক্ষণ আমার ছবি আঁকা দেখছিল। এখন আমার ক্লান্ত লাগছে। তাই শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম। আধশোয়া অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি সমুদ্র কূল অর্ধ চন্দ্রাকারে দূরে মিলিয়ে গেছে। ক্ষীণ রুপোলি আলোর রেখা উপকূলের ওপর দিয়ে ফলার মতো চলে গেছে। কোবের কথা চাপা পড়তে শুরু করলো হঠাৎ এক FM Channel এর গানের আওয়াজে। দেখলাম এক কৃষ্ণাঙ্গ লোক কাঁধে একটা বড় radio নিয়ে চলেছে। সঙ্গে বৌ, দুই বাচ্চা। গান হচ্ছে এদের স্থানীয় ভাষায়। আর মাঝে মাঝে অতি নাটকীয় স্বরে French ভাষায় গান সম্পর্কে কেউ কিছু বলছে।

কোবে কে ঐ গান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় ও বলল যে গানটা মালি দেশের, আইভরি কোস্টের ভাষায় নয়। ঐ radio নিয়ে পরিবারটি মালি থেকে এসেছে হয়ত। মালি তো উত্তর পশ্চিম দিকেই রয়েছে। তার আরেক পাশেই গিনি (Guinea)। আসলে এই জায়গাটা Gulf of Guinea র ওপরেই অবস্থান করছে। সমুদ্রের একটা দীর্ঘ গোলাকৃতি অংশের মধ্যে এই আবিদয্যান শহরটি। মালি ছাড়াও রয়েছে বুরকিনা ফাসো, লিবেরিয়া আর ঘানার মতো প্রাচীন ঐতিহ্যশালী দেশসমূহ এই আইভরি কোস্ট কে ঘিরে। আইভরি কোস্টের প্রধান ভাষা ফরাসীর সঙ্গে কয়েক প্রজাতির আদিম ভাষার চলও আছে। যেমন বাউলে, দিউলা, দ্যান, সেবারা সেনুফো এরকম কত ভাষায় কত লোকে কথা বলে। বাউলে আর দিউলা তে অনেক সুন্দর গানও শুনেছি। এদের অনেক ভাষাই এই সব প্রতিবেশী দেশ গুলোয় ব্যবহৃত হয়। বহু ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও আটলান্টিকের গায়ে লেগে থাকা এই আদিমতম ভূখন্ডে মধ্যমনি হয়ে উঠেছে ইতিহাসের এই ফরাসী উপনিবেশ Cote d'ivoir। আর এই দেশের সবচেয়ে আদরের শহর আবিদয্যান হয়ে উঠেছে পর্যটকদের স্বপ্নের ঠিকানা। হয়ে উঠেছে বেচা কেনার আদর্শ সংযোগ স্থল। দেশের দক্ষিণ-পূর্বে Gulf of Gunea র কোলের ভেতরে একটা পরিবেষ্টিত জলস্থলে (lagoon) আবিদয্যান অবস্থিত। আবিদয্যানের পাশাপাশি আরও কয়েকটা শহর প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে এই দেশে। দেশের মধ্যাংশে রয়েছে ল্য প্লাতো (Le Plateau), সবচেয়ে নামী ব্যবসাঞ্চল। বিত্তশালীদের আধিপত্য এখানে। তাই এ

The beach Abidjan

দেশের প্রাণকেন্দ্রে Le Plateau সেজে উঠেছে বহুতলের ওপর বহুতলে। আলোর মালা প্রসারিত হয়েছে শহর ছাড়িয়ে দিকচক্রবালে। অবশ্যি আইভরি কোস্ট অনেক প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। হাতির দাঁতের সরবরাহ হত ইওরোপে। এই ব্যবসাই সুপরিচীত করে এই দেশকে প্রাচীনকাল থেকে। সেটা এর নাম থেকেই অনুমান করা যায়। আবিদয্যানই এই ব্যবসার প্রধান স্থল ছিল। তবে ব্যবসার মুনাফা লুটতো ইওরোপীয়ানরাই। প্রথমে ফরাসীরা, তারপরে পর্তুগীজরাও আরও অনেকে এই ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। যাদের হাতি, তারা শ্রমিক হয়েই চোদ্দ পুরুষ কাটিয়ে দিয়েছে। হাতিও আর আগের মতো নেই। তবে সাহেবদের দেওয়া নামটা রয়ে গেছে – Ivory Coast।

একটু হেঁটে গেলেই আমার থাকার জায়গা। বেশ মনোরম বিশ্রামাগার। ফিরে আসতেই দেখলাম লবি তে অনেক ভিড়। Reception desk এর দুই পুরুষ আর দুই মহিলা নবাগত অতিথিদের সময় দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। ওপর থেকে ঝালর দেওয়া আলোয় পুরো জায়গাটা ঝলমল করছে। কৃষ্ণাঙ্গ সুবেশী ভদ্রলোকেরা, ভদ্রমহিলারা ব্যস্ত, কেউ কেউ এক একটা জায়গা কেন্দ্র করে জমায়েতে। তাদের মধ্যে পশ্চিমী প্রভাব লক্ষণীয়। শুদ্ধ ফরাসীতে বাক্যালাপ চলছে। এখানে উপস্থিত আছে অনেক শ্বেতাঙ্গ মানুষ। কেউ sofa য় বসে coffee চুমুক দিচ্ছে। কেউ কেউ গল্প করছে। কিছু তরুণ তরুণীরা পাশেই smoking zone এ ব্যস্ত। আমি লবি সংলগ্ন সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে যেন অন্য এক বিশ্বকে দেখছি। এখানে যে কোনো মানুষের সঙ্গেই আমার চেহারাগত পার্থক্য প্রচুর। আমার ভারতীয় ত্বকের রং ও একেবারেই ভিন্ন। আমার এই ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতেই মনে হয় এক স্থানীয় ভদ্রলোকের আবির্ভাব হলো। "Bonsoir" বলে সম্ভাষণ করে আমার দিকে এগিয়ে এল যে ব্যক্তি, তার চেহারা আমার আড়াই গুণ বেশী তো হবেই। সুঠাম, গাঢ় কাল চেহারা, তার ওপরে কালো ব্লেজারে ওকে এক আশ্চর্য্য বলিষ্ঠ রুপ দিয়েছে। আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমার হাত টা কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখলো। আমাদের দু'জনের হাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, 'তুমি কোথাকার লোক?' আমি ভারতীয় শুনে হেসে বলল, 'জানো তো ভাই, গোটা বিশ্ব কেবলমাত্র দুটো রং এ বিভক্ত। কালো আর সাদা। তা' তোমার অস্তিত্ব কোথায়?' এই বলে সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি মেলে ধরে প্রায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। প্রথমে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। তারপর ওর রসিকতা টা বুঝে মজা পেলাম।

মজা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কথায় যেন চিরকালের অনিবার্য দুই গোলার্ধের কথা মনে করিয়ে দিল। সামনের এই কালো মানুষগুলোকে যেন সাদা মানুষদের পোষাক পরিয়ে আলোর নীচে দাঁড় করানো হয়ছে। ওপর থেকে সাদা আলো ওদের শোষণ করছে। সেই সাদা আলোর সাদা মানুষেরা হাতে পান পাত্র নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে মজা দেখছে। কি ভালো, আর কি মন্দ... সব কিছুই দেখা হয় ঐ সাদা আলোর বলয়ে। বাইরে তখন তাকিয়ে দেখি অন্ধকার। দূরে সমুদ্র কালো হয়ে গেছে। সমুদ্রের থেকে কালো কালো মানুষ সামুদ্রিক প্রাণীর মতো উঠে আসছে। আবার কালো অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওটা যেন আরেকটা গোলার্ধ, যেখানে শুধু জমে থাকা অন্ধকার। অন্ধকারের চোখ দিয়ে কি কিছু দেখা যায় ? সে চোখ তো বুজে আছে।

আবার বেরিয়ে এলাম বাইরে অন্ধকারে। অদূরে সমুদ্রের থেকে বড় বড় নৌকো টেনে টেনে বালির ওপরে তুলছে কিছু ছায়া দেহ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম বেশ অনেকটা। চারিদিকে নোনা হাওয়া বইছে। সামুদ্রিক মাছের গন্ধে শরীর ভরে গেল। অন্ধকারে সমুদ্রকে কেমন Surreal অস্তিত্ত্ব বলে বোধ হয়। জলের উপরতলের সামনে কিংবা পেছনে কোনো মাত্রা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখন ঢেউয়ের শব্দ দিনের বেলার ঢেউ য়ের চেয়ে অনেক জোরালো। ঐ শব্দ স্রোতে অদূরের হোটেলের কোলাহল ও অশ্রুত হয়েছে। শুধু এই ছায়া শরীরদের কিছু অস্ফুট শব্দ পাচ্ছি। আর ভারী নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। খুব কাছে গিয়ে তাদের দেখলাম। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যাওয়া সেই শরীরগুলো যেন পাথরের। মাঝে মাঝে জলরাশির দূরে কোনো ঘূর্ণীয়মান বাতিঘর থেকে হালকা আলোর ঝলক আসছে। সেই আলোয় এই ছায়াসম ধীবরদের অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। কঠিন শক্ত চোয়ালও চোখে পড়ছে। মুখাবয়বের গভীর বলিরেখা গুলোও এখন দৃশ্যত: হয়ে উঠছে। নোনা হাওয়ার এক ঝটকায় যেন সুদূর অতীতে চলে গেলাম। সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি এই মানুষগুলোই যেন এই একই কাজ করে চলেছে। পৃথিবী তোলপাড় হয়ে গেলেও ওরা থামবে না। ভবিষ্যতেও ওদের এভাবেই দেখা যাবে।

মহাবিশ্বের অনন্ত যাত্রাপথের এই শ্রমজীবীদের দেখে বাকরুদ্ধ হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমাদের সভ্যতার জয়রথের আলোয় কি এ অন্ধকার দূর হবে না। না কি এই ছায়া শরীরদের ছাড়া এই রথের জয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে যাবে ! তা'ই এত উন্নতির শিখরে এসেও মানুষের দাসের প্রয়োজন চলে যায়নি। দাসত্বের অনেক প্রকারান্তর হয়েছে বোধ হয়। সেই দাসবৃত্তি কে আরও কত বৈচিত্র্যে, কত মাহাত্ম্য দিয়ে প্রয়োগ করা যায়, ... এটাই সভ্যতার মূল লক্ষ্য। তা'ই মনে হয় এই ছায়াবয়ব শ্রেণীকে মেনে নিতে হয়েছে সভ্যতার ইতিহাসের এই চরম সত্যকে। এই সত্যই তো মানুষে মানুষে বিভাজন এনেছে। আলোর দুনিয়াকে করে তুলেছে গৌরবাণ্বিত, আর ছায়াকে করেছে অস্পৃশ্য।

My painting – 'Abidjan'

তবুও এই ছায়াশ্রেণী গান বাঁধে। নেচে ওঠে আপন ছন্দে। কি অপ্রতুল জীবনী শক্তি তাদের। তাদের এই জীবন রসদের ওপরেও আলো শ্রেণী থাবা দিতে ভোলে না। তাই বিশ্বায়নের স্রোতে ছায়ার অনেকাংশই আলোর সঙ্গে মিশ্রণে ধূসর হয়ে ওঠে। তখন সেই মিশ্রিত ছায়া গোষ্ঠী আলোর শোষণ কর্মকান্ডে অনুঘটকের ভূমিকা নেয়। দূর থেকে দেখে আমরা অভিনন্দন জানাই সভ্যতার অগ্রগতি দেখে ! এই প্রসঙ্গে আইভরি কোস্টের প্রখ্যাত কবি তানেলা বনি'র লেখা উল্লেখ করি। তার ফরাসীতে লেখা পদ্য বাঙলায় তর্যমা করার চেষ্টা করলাম:

" আমি স্বপ্ন দেখি এক অসীম সাগরের কবিতার
আমি নেচে উঠি ত্বকের নীচের স্বাগত ধ্বনির তালে
পায়ের জমি – আমার বসত
যখন অজস্র পালিত আত্মার হাত
শক্ত তারের বেড়া বুনে চলে
আমি জানি না , আমরা একসঙ্গে বেঁচে আছি কি' না
এক সম বিভাজনের নির্দেশিকার মুখে –
ভুলে যাও সেই সোনা তৈরীর ক্ষার – স্বপ্ন,
আর প্রয়োজনীয় মিশ্রণের অস্তিত্ত্বকে ...." ।।

তানেলা র জন্ম ও বড় হওয়া এই আবিদয্যান এ । তিনি সমকালীন আফ্রিকান সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্যা । দীর্ঘদিন দর্শন নিয়ে অধ্যাপনা করছেন । একসময়ে তার কিছু প্রতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল লেখার জন্য তিনি বিতর্কিত হয়ে উঠেছিলেন । তখন এ দেশে ধর্মীয় কোন্দল আর প্রজাতিভিত্তিক দ্বন্দ্ব আগুন ছড়াচ্ছিল । এর উপরে যুক্ত হয় আর্থিক কষ্ট আর প্রতিবেশী দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা । ক্রমে এই সঙ্কট গৃহযুদ্ধের আকার নেয় । তানেলা স্বেচ্ছা – নির্বাসন নিয়ে দেশ ত্যাগ করে ফ্রান্সে বসবাস করতে থাকেন । ২০০২ থেকে ২০১২ সাল অবধি আইভরি কোস্টে পা রাখেন নি, যতক্ষণ না শান্তি চুক্তি স্থাপন হয় । দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়ে নতুন সরকার তৈরী হয়েছে ২০১০ এ । অচলাবস্থা কাটিয়ে বিশ্বায়নের স্রোতে আইভরী কোস্ট নতুন দিনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল তখন থকেই ।

Tanella Boni – photo courtesy: fratmat.info

Highway Abidjan

Subrata Ghosh is a contemporary practising visual artist who loves to explore various media and disciplines through his practice. Subrata has achieved many national and international recognitions including a research scholarship from UNESCO - ASCHEBERG, Paris. He had his exhibitions in many places in India and overseas.

BALCONY

The English publication from Batayan group
April 2021

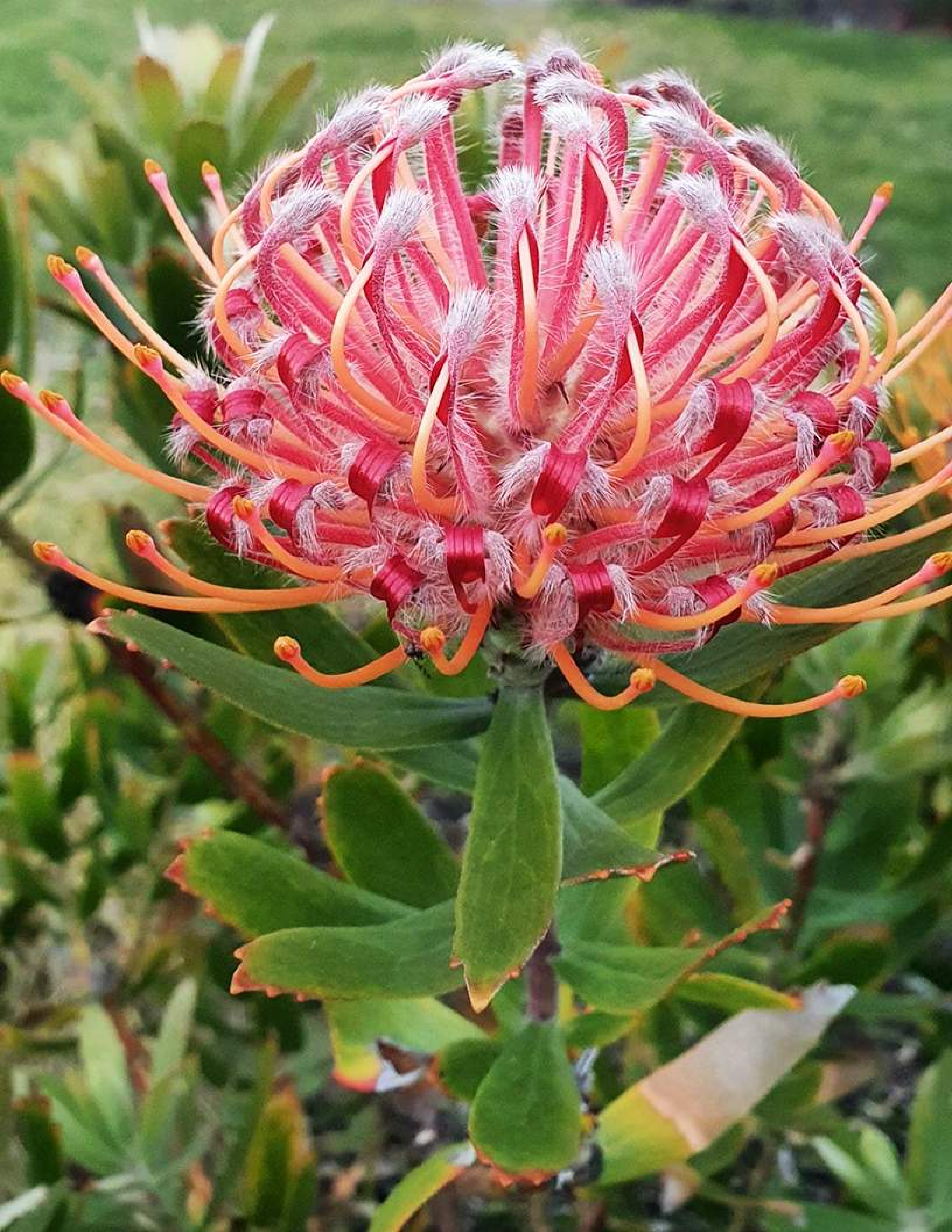

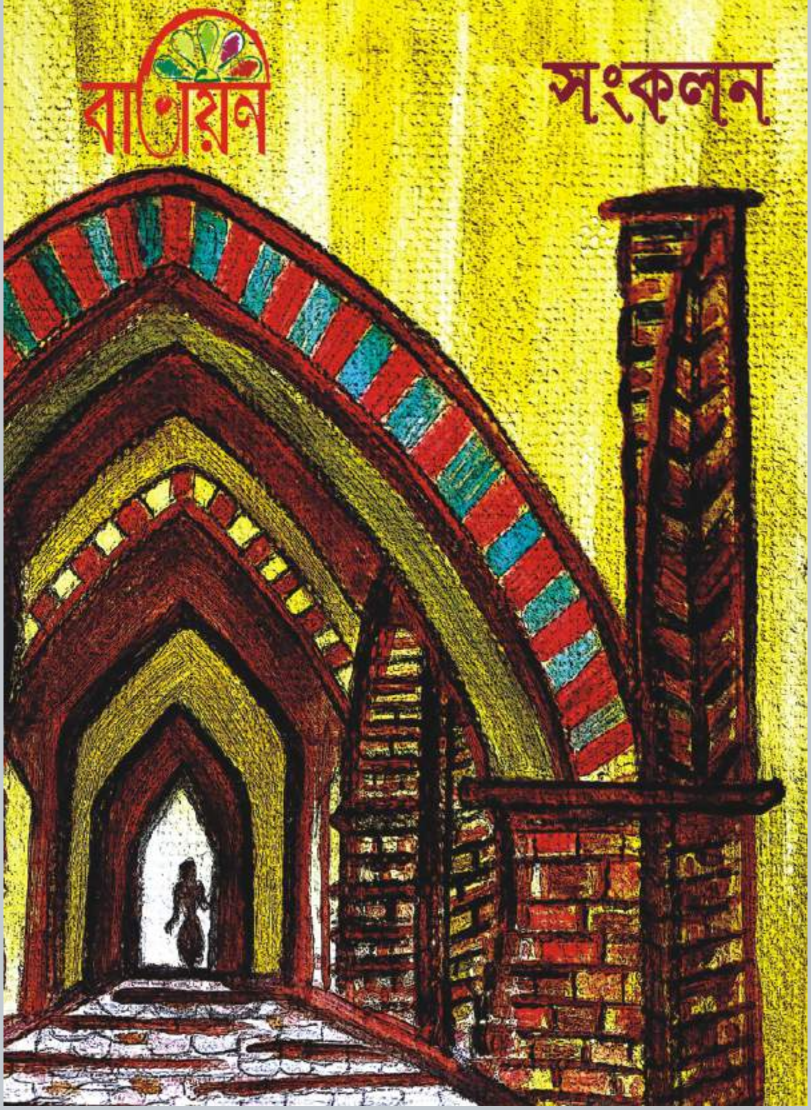

"প্রবাসীদের বাংলা-চর্চাকে বরং আরও কিছুটা নিবিড়ভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে হয়তো কেবল এই কারণেই যে, তাঁরা এই চর্চার পথে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, প্রতিনিয়ত। ফলে ভাষা-সংক্রান্ত যে-কোনও একটি কাজ আমরা যতটা অনায়াসে সংঘটিত করে ফেলতে পারি, দেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ অন্য আবহাওয়া ও সংস্কৃতির বাসিন্দা হয়ে তাঁরা সেটি তত অনায়াসে পারেন না।

বাতায়ন-ও তেমনই একটি প্রয়াস, প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চায় যাকে এখন অগ্রগণ্য বললে ভুল হয় না। অনেকদিন ধরে, অনেক কাঠিন্যের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই কাগজ আজ যেভাবে বিস্তীর্ণ পাঠককুলের কাছ থেকে মর্যাদা আদায় করে নিতে পারছে, তাতে বাংলা ভাষার একজন সামান্য কর্মী হিসেবে আমারও গর্ব হয় বৈকি। আমরা এখন কথায় কথায় বলি বটে, বিশ্বায়নের এই যুগে দেশ বলে আর নেই কিছু, কিন্তু আমি নিজে অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আজও দেশের মাটি থেকে দূরে বসবাস করে নিজের ভাষায় একটি যথাযথ মানের পত্রিকা বার করতে কতখানি ক্লেশ পোহাতে হয়। বাতায়ন বহুদিন যাবত সেই ক্লেশের আগুন পার করে এসে এখন পাঠকমহলে উজ্জ্বল।"

শ্রীজাত

"বাতায়ন", ভালবাসা, ভুবনায়ন

বেশ বুঝতে পারছি আজকের ডিজিটাল দুনিয়াতেও মুদ্রিত একটি বই হাতে ধরার আনন্দ ম্লান হয়ে যায় নি। এই অতিমারীর দিনে এটাই আশার কথা। গল্প, কবিতা, নাটক আর প্রবন্ধে বেঁধে বেঁধে থাকা – এসবের মধ্যে দিয়েই তো দূর হয়ে ওঠে নিকট বন্ধু আর পর হয়ে ওঠে ভাই। পাঠকদের মনে বাতায়নের জন্য এই ভালবাসার আসনটি পাতা যাতে পাতা থাকে সে চেষ্টা করে যাব আগামী দিনগুলোতে। ভবিষ্যতের চেহারা কেমন তা সবসময়ই আঁকা কঠিন। আজকের পরিস্থিতিতে হয়তো দুরূহ। কিন্তু আলোকশিখার মতো একটি ভাবনা হৃদয়ে জ্বালিয়ে রাখি।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, "বাতায়ন" পত্রিকা গোষ্ঠী